[আমাদের ছুটি - ২৫শ সংখ্যা]

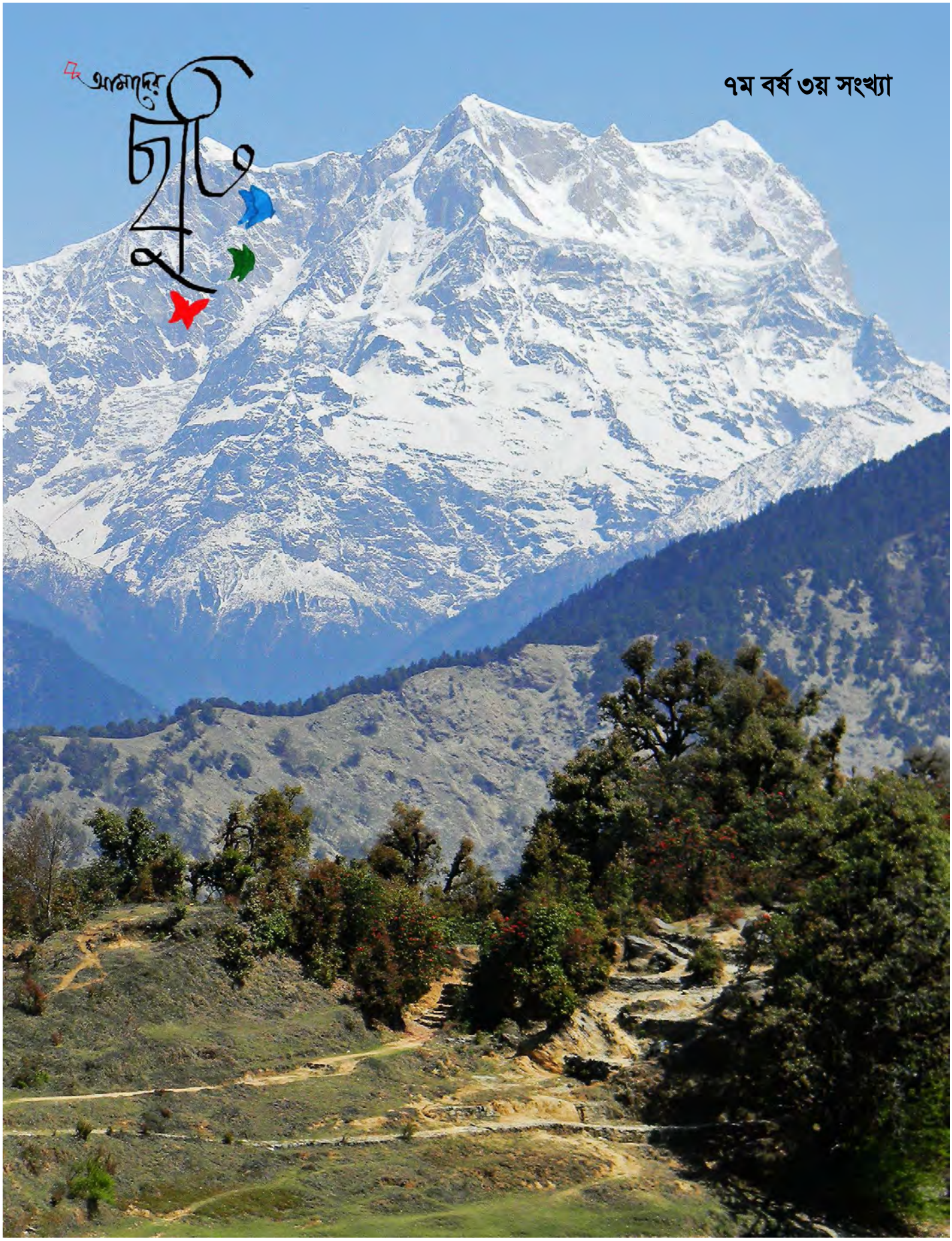

দেওরিয়া তাল থেকে দেখা তুষারাবৃত চৌখাম্বা - আলোকচিত্রী- পল্লব চক্রবর্তী

বেড়ানোর কথা
আর ছবি নিয়ে
বাংলা
ই-ম্যাগাজিন

আমাদের বাংলা | আমাদের দেশ | আমাদের পৃথিবী | আমাদের কথা

~ ৭ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা - কার্তিক ১৪২৪ ~

নীরব রজনী দেখ মগ্ন জোছনায়/ ধীরে ধীরে অতি ধীরে গাও গো/ রজনীর কণ্ঠসাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো...

জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে ভিজে বালির চর। চিকচিক করছে ঢেউয়ের মাথায় মাথায়। পাড়ে প্রায়ান্ধকার ঝুপড়ি দোকানগুলোর একটার সামনে চেয়ারে বসে মায়ের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান করছি। আশপাশের টুকিটাকি কথাবার্তা আওয়াজ ক্রমশ কমে আসছে...

খুব ভোরবেলায় একা একাই চলে এসেছিলাম সমুদ্রের কাছে। সৈকতে ট্যুরিস্ট কেউ ছিল না। দু-একটা দোকানের সবে ঘুম ভেঙেছে। আকাশের কালো মেঘ সূর্যকে আড়াল করে তার লালে মিশে যাচ্ছিল। তারপরে অনেকটা হাঁটা দুজনে, সেই মোহনা পর্যন্ত।

দুদিনেই তাজপুরকে বড্ড ভালোবেসে ফেললাম আমরা।

দেখতে দেখতে পঁচিশটা সংখ্যা। অনেক বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে বন্ধুদের হাত ধরে 'আমাদের ছুটি'-র যাত্রা অব্যাহত। এখন তো সব শারদ পত্রিকা পড়া শেষ। উৎসবের পালাশেষে আমাদের এই উৎসব মেজাজের সংখ্যা।

ভালো থাকুন সক্কলে। আর আসন্ন শীতের রোদ্দুর গায়ে মেখে বেরিয়ে পড়ার স্বপ্ন দেখুন। সবার পক্ষে তো সত্যি বেরোনো সম্ভব হবে না - সেই তালিকায় থাকছি আমরাও। তবু মনে মনে বেরোতে ক্ষতি কি 'আমাদের ছুটি'-র পাতায় পাতায় - 'ইন্টারনেটে ঢুকে খুঁজছি কপাল ঠুকে ছুটি ডট কম।'

- দময়ন্তী দাশগুপ্ত

এই সংখ্যায় -

"ঐ বৈভার এবং তৎসন্নিহিত রত্নাচল পর্ব্বত মধ্যস্থিত উপত্যকা ভূমিতেই জরাসন্ধের রাজপ্রাসাদ ছিল, এবং তাহা হইতেই গিরিব্রজপুরের আধুনিক নাম রাজগৃহ হইয়াছে।"
- শ্রী রামলাল সিংহের কলমে "রাজগৃহ বা রাজগিরি দর্শন"

ওই যে পাহাড়ের গায়ে যে রঙিন বাড়িটা দেখা যাচ্ছে দূরে, অনেকটা দূরে, ওর মধ্যেও তো এক চেনা গেরস্থালি আছে মানুষের; সেও কি আমার আপনজন নয়?
- ধারাবাহিক ভ্রমণকারী বন্ধুর পত্র - লাদাখ পর্ব-এর চতুর্থ পত্র
দময়ন্তী দাশগুপ্তের কলমে

~ আরশিনগর ~

স্মৃতি বুনে এলাম - অধীর বিশ্বাস

দিনে দিনে বর্ধমানে - তপন পাল

যে বন কুয়াশা-ছাওয়া - কনাদ চৌধুরী

~ সব পেয়েছির দেশ ~

অরণ্যের দিনরাত্রি ও আমাডুবি
- অভিজিৎ কুমার চ্যাটার্জি

কালাপানির অন্দরমহলে - পর্ণা সাহানা

জাঠ রাজাদের রাজধানীতে
– অতীন চক্রবর্তী

তুঙ্গনাথ-চন্দ্রশিলা আর মায়াবী চাঁদের দেওরিয়াতাল
– পল্লব চক্রবর্তী

~ ভুবনডাঙা ~

ভূস্বর্গ সুইৎজারল্যান্ড – শ্রাবণী ব্যানার্জী

ইন্দোনেশিয়ার ডায়েরি – দেবলীনা দাস

~ শেষ পাতা ~

বর্ষায় কৈখালি – দীপাঞ্জনা দত্ত বিশ্বাস

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com ● Web Design: Madhuwanti Basu

বেড়ানোর মতই বইপড়ার আদতও বাঙালির চেনা সখ - তা ছাপা হোক বা ই-বুক। পুরোনো এই ভ্রমণ কাহিনিগুলির নস্টালজিয়া তাতে এনে দেয় একটা অন্যরকম আমেজ। আজকের ভ্রমণপ্রিয় বাঙালি লেখক-পাঠকেরা অনেকেই শতাব্দীপ্রাচীন সেইসব লেখাগুলি পড়ার সুযোগ পাননি। পুরোনো পত্রিকার পাতা থেকে অথবা পুরোনো বইয়ের নির্বাচিত কিছু অংশ তাই পুনর্মুদ্রিত হচ্ছে 'আমাদের ছুটি'-র পাঠকদের জন্য।

।বিভিন্ন সূত্র থেকে শ্রী রামলাল সিংহ সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য পেয়েছি তা হল - পাটনানিবাসী বি-এল উপাধিধারী শ্রী সিংহ ছিলেন প্রবাসী বাঙালি সাহিত্যিক। নব্যভারত পত্রিকার ১৩০২ সালের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যাদুটিতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত এই লেখাটি পড়ে পত্রিকার সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী শরীর সারানোর উদ্দেশ্যে মাসখানেক রাজগিরে কাটান ও ফিরে এসে তিনিও পরবর্তীতে পত্রিকায় রাজগির নিয়ে একটি দীর্ঘ ভ্রমণকাহিনি লেখেন। সেই দিক থেকে লেখাটির একটা অন্য গুরুত্বও রয়েছে। সেইসময়ের হিন্দু বাঙালির তীর্থভ্রমণের এই কাহিনিটিতে ধর্ম এবং জাতিবোধের কিছু প্রাবল্য থাকলেও ভ্রমণের বর্ণনা আকর্ষণীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে বাঙালির তীর্থভ্রমণ কাহিনি শাখাটি কিন্তু সম্পূর্ণতই পুরুষ লেখকদের নির্মিত। সেকালের বাঙালি নারীর ভ্রমণকাহিনিতে এ বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি একেবারেই ভিন্নগোত্রের। তবে যে কোনও লেখাকে তার সমকাল দিয়ে বিচার করাই ভালো।
এই লেখায় উল্লিখিত 'সরস্বতী' নদীটি আসলে 'শর্বতী' নদী। স্থানীয় মানুষদের উচ্চারণ অনুধাবনে লেখক হয়তো ভুল করেছিলেন। ভুলটি নজরে এনে আমাদের ধন্যবাদার্হ করেছেন 'আমাদের ছুটি'-র বন্ধু হিমাদ্রী শেখর দত্ত।।

রাজগৃহ বা রাজগিরি দর্শন

শ্রী রামলাল সিংহ

কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের রৈবতক পাঠে মহাভারতের সেই ঐতিহাসিক ক্ষেত্র, হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনের পুণ্য-তীর্থ ভূমি 'গিরিব্রজপুর' বা আধুনিক রাজগৃহ দেখিবার বাসনা বহুদিন হইতে মনোমধ্যে পোষণ করিতেছিলাম। আত্মীয়-বন্ধুগণের মুখে সেই রমণীয় স্থানের বর্ণনা শুনিয়া ঔৎসুক্য দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছিল। অবশেষে বিগত ১৮৯৪ সালের ২৪ শে ডিসেম্বর তারিখে, রবিবার বেলা ১০টার লোকেল ট্রেনে আমরা কয়েক জন বন্ধু, দুইজন চাকর, একজন রাঁধুনি ব্রাহ্মণ সমভিব্যাহারে, বাঁকিপুর রেলওয়ে ষ্টেসনে উঠিয়া ২৮ মাইল পূর্ব্ববর্ত্তী বখ্‌তিয়ারপুর ষ্টেসনে বেলা ১২টার সময় উপস্থিত হইলাম।
এক্ষণে ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ষ্টেসন বখ্‌তিয়ারপুর হইয়াই রাজগৃহ যাইতে হয়। বখ্‌তিয়াপুর হইতে বিহার ১৮ মাইল দক্ষিণে এবং বিহার হইতে রাজগৃহ ১৫ মাইল পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে। বখ্‌তিয়ারপুর হইতে বিহার যাইতে হইলে লোকেরা সচরাচর মেল কার্টে যায়, কারণ গরুর গাড়ীতে যাইতে বড় বিলম্ব হয়, প্রায় ১২ ঘন্টা লাগে, এবং এক্কায় যাওয়া বড় কষ্টকর। কিন্তু রাজগৃহ দর্শনার্থী পশ্চিম দেশীয় যাত্রীরা স্ত্রী পুত্র পরিবারবর্গ লইয়া গরুর গাড়ীতেই গিয়া থাকেন। যদিও বখ্‌তিয়ারপুরে ধর্ম্মশালা, ডাক্‌বাঙ্গালা প্রভৃতি থাকিবার স্থান ছিল, কিন্তু সকলের মত হইল, পর দিনের অপেক্ষা না করিয়া ৭টা রাত্রেই যাওয়া শ্রেয়। রিজার্ভ গাড়ীতে আমাদের মধ্যে ছয়জন, এবং অনেক অনুনয় বিনয় করাতে মেনেজার মহাশয়ের অনুমতি ক্রমে একজন চাকর সঙ্গে করিয়া বেলা তিনটার সময় বিহারাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এবং রাত্রি ৭টার সময় আমরা বাকী ছয়জন সেই পৌষ মাসের দারুণ শীতে স্পেশেল কার্টে যাত্রা করিলাম। বখ্‌তিয়ারপুর হইতে বেহার যাইবার পাকা রাস্তার দুইধারে সারি সারি নানা রকমের বড় বড় গাছ, মধ্যে মধ্যে বড় বড় সুন্দর পুল; কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী স্থান অতি নিম্ন জলাভূমি বলিয়া গ্রামাদির সংখ্যা বড় কম। মেলকার্ট যাইতে তিন ঘন্টা লাগে। তিন জায়গায় ঘোড়া বদল হয়; বন্দোবস্ত মন্দ নয়।
বিহারঃ- আমরা বিহারে পঁহুছিয়া রবিবার রাত্রে স্বর্গীয় ডিপুটি বিমলা চরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যত্নে প্রতিষ্ঠিত 'বেলিসরাই' নামক বিশ্রামগৃহে অতিবাহিত করিলাম। বেলিসরাই চাঁদার পয়সায় তৈয়ার হয়, উহা বিমলা বাবুর যত্ন এবং অধ্যবসায়ের পরিচয় দিতেছে। এমন সুন্দর সরাই দেখি নাই। দক্ষিণে সরাই, বামে দাতব্যচিকিৎসালয়; প্রবেশ দ্বারে বিচিত্র রঞ্জিত ইষ্টক-নির্ম্মিত ক্লক্-টাওয়ার। টাওয়ারোপরি ঘড়ির সরঞ্জামও কিছু কিছু দেখা গেল। সরাইয়ের সম্মুখভাগে নাতিপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে সারি সারি নারিকেল বৃক্ষ। সরাই দুইভাগে বিভক্ত, পূর্ব্বদিকে ভদ্রলোকদিগের থাকিবার জন্য সারসী খড়-খড়ী দেওয়া পাকা ঘর, প্রত্যেক ঘরের ২৪ ঘন্টার ভাড়া ৷৷০ আনা মাত্র, কিন্তু একঘরে ৮ জনের অধিক লোক থাকিবার অধিকার নাই; পশ্চিম দিকে গরিবদিগের থাকিবার জন্য ছোট ছোট পাকাঘর, প্রত্যেক যাত্রীর একদিন থাকিবার ভাড়া এক পয়সা মাত্র। এই দুই বিভাগের মধ্যে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণে বৃহৎ কূপ। ভদ্রলোকদিগের থাকিবার যে বিভাগ, তাহা আবার অর্দ্ধেক হিন্দুর জন্য এবং অর্দ্ধেক মুসলমান এবং ভিন্ন জাতির জন্য বিভক্ত। এক এক অংশে পাঁচ ছয়টি করিয়া ঘর। বাড়ীর প্লিন্থ খুব উচু, চারিদিকে পলতোলা বড় বড় যোড়া থামওয়ালা বারাণ্ডা, কার্ণিসে সুন্দর কারুকার্য্য। উত্তর দিকে ছাতে যাইবার দুইটী সিঁড়ি, সরাইয়ের ছাত হইতে হাঁসপাতালের ছাতে যাইবারও পথ আছে। শুনিলাম, এক সময়ে সরায়ের প্রত্যেক ঘর টানাপাখা, টেবিল, চেয়ার, খাট প্রভৃতি নানা রকম সরঞ্জামে সুসজ্জিত ছিল। কিন্তু এক্ষণে সে সব কিছুই নাই। এ সরায়ের ভার আজকাল মিউনিসিপালিটির হস্তে, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষদিগের অযত্নে দিন দিন অমন সুন্দর সরাই নষ্ট হইয়া যাইতেছে। পাকা সারসী-খড়খড়ীওয়ালা পাইখানার আধুনিক অবস্থা বড়ই শোচনীয়।
আমরা রাজগৃহে যাইবার এবং সেখানে থাকিবার বন্দোবস্ত করিবার জন্য সেই রাত্রেই ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ওভারসিয়ার বাবু নন্দলাল মুখোপাধ্যায়ের নিকট গেলাম, তাঁহার সঙ্গে আমাদের মধ্যে দু এক জনের অল্প আলাপ ছিল এবং তাঁহার নামে চিঠিও আমাদের কাছে ছিল। নন্দবাবু বড় ভদ্রলোক, তিনি সেই রাত্রেই আমাদের রাজগিরি যাইবার জন্য তিনখানি উৎকৃষ্ট স্প্রিংওয়ালা এক্কা এবং একখানি গরুর গাড়ী ঠিক্ করিয়া দিলেন, এবং রাজগৃহে ইন্সপেক্সন্ বাঙ্গালায় থাকিবার অনুমতি দিলেন। প্রত্যেক এক্কায় যাইবার আসিবার ভাড়া ৩৲ টাকা এবং যে কয় দিন থাকিবে প্রত্যেক দিনের খোরাকী ৷৷০ আনা, এবং গরুর গাড়ির যাইবার আসিবার ভাড়া ১৷৷০ টাকা স্থির হইল। আমরা সে রাত্রে খাবার বিশেষ গোলযোগ না করিয়া বাজারের মোটা লুচি ও ধূলামাখা মিষ্টান্ন খাইয়া জঠরানল নিবৃত্তি করিলাম।
সোমবার - প্রত্যুষে গরুর গাড়ীতে আমাদের বিছানা পত্র এবং একজন চাকর রওনা করিয়া দিলাম। আমরা মুখ হাত ধুইয়া চা রুটি খাইয়া রাঁধুনি ব্রাহ্মণ এবং এক বেলার মত আহারীয় সামগ্রী সঙ্গে লইয়া বেলা সাতটার সময় রাজগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম। বিহার হইতে রাজগৃহে যাইবার দুইটি পথ, একটি গিরিইয়াক্ হইয়া এবং অন্যটি শিলাও হইয়া। গিরিয়াকের পথ পাকা কিন্তু তিন জায়গায় নদী পার হইতে হয় এবং সে পথে রাজগৃহ ১৮ মাইল; শিলাওয়ের

পথ কাঁচা কিন্তু ঐ পথে নদীপারের গোলযোগ নাই, আর রাজগৃহ ১৫ মাইল মাত্র, লোকে সচরাচর এই পথেই রাজগিরি গিয়া থাকে। আমরা শিলাওয়ের পথে চলিলাম। দক্ষিণাভিমুখে কিছুদূর গিয়া পঞ্চানন নদ পার হইলাম; নদবক্ষ শুষ্ক, স্থানে স্থানে কেবল একটু একটু জল দেখা যাইতেছে। পঞ্চানন নদ পার হইয়া গিয়া বরাগাঁও যাইবার পথ দেখিলাম। বরাগাঁও বুদ্ধের প্রধান শিষ্য শারিপুত্রের জন্মস্থান বলিয়া খ্যাত। নলন্দা বৌদ্ধবিশ্ববিদ্যালয় এইখানেই ছিল, শুনিলাম, আজি তাহা বৌদ্ধ মন্দির ও সমাধির ভগ্নরাশি বক্ষে ধারণ করিয়া কাল মাহাত্ম্যের পরিচয় দিতেছে। আমরা সময়াভাবে বরাগাঁও যাইতে পারিলাম না। পথের দুইপার্শ্বে বিস্তৃত ধান্যক্ষেত্রের মনোরম শোভা দেখিতে দেখিতে, খর্জ্জুর ও তালিবনের মর্ম্মর শব্দ শুনিতে শুনিতে, বেলা সাড়ে দশটার সময়, শিলাও গ্রামে উপস্থিত হইলাম। শিলাও একটি বর্দ্ধিষ্ঠ গ্রাম, প্রায় তিন চারি হাজার লোকের বসতি হইবে। এখানকার খাজা ও চিঁড়ে প্রসিদ্ধ। আমরা দুইই কিছু কিছু কিনিলাম। ভাল খাজা টাকায় ⁄২৷৷০ সের এবং চিঁড়ে ⁄১৩সের ⁄১৪ সের করিয়া। শিলাও হইতে প্রায় দুই মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে গিয়া আমরা আধুনিক রাজগৃহ বা রাজগিরি গ্রামে উপস্থিত হইলাম। রাজগিরি নিতান্ত ক্ষুদ্র গ্রাম নয়, অনেক গুলি পাকা বাড়ী দেখিলাম, বাজারও মন্দ নয়। এখানে একটি বৃহৎ সাধু-সঙ্গত আছে। রাজগিরির বাজারে আমরা কিঞ্চিৎ ঘি এবং তেল কিনিয়া আমাদের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ইন্সপেক্সন্ বাঙ্গালাভিমুখে চলিলাম। রাজগিরি গ্রাম হইতে একপোয়া পথ পশ্চিম দক্ষিণ দিকে গিয়া সেই বাঙ্গালায় পঁহুছিলাম। সেখানকার চৌকিদার, আমরা নন্দ বাবুর পরিচিত ভদ্রলোক, শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ঘরের দরজা খুলিয়া দিল। বাঙ্গালায় দুইটি ঘর, সম্মুখে বারাণ্ডা, ঘরের মেঝেতে মেটীং করা, উপরে চাঁদওয়া; টেবিল, চেয়ার, আলগানি খাট প্রভৃতি নানারকম ইংরাজী আসবাবে ঘরগুলি সজ্জিত, প্রত্যেক ঘরের সংলগ্ন একটি একটি বাথরুম, তাহাতে কমোড ইত্যাদি রহিয়াছে দেখিলাম। সাহেবেরা আসিয়া এই খানে থাকেন। সার চার্লস ইলিয়াট এইখানে ছিলেন। আমাদের ইন্সপেক্সন্ বাঙ্গালায় পঁহুছিতে প্রায় দুই প্রহর হইল। পরামর্শ হইল যে, মকদুম কুণ্ড নামক উষ্ণপ্রস্রবণে স্নান করিতে হইবে, কিন্তু সেখানে মুসলমান ভায়ারা যেরূপ ভাবে দখল করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন, দেখিলাম তাহাতে স্নান করিতে ভক্তি হইল না। পরে সপ্তধারায় স্নান করাই স্থির হইল। পথে যাইতে যাইতে নদীতে বিস্তর ছোট ছোট মাছ খেলা করিতেছে দেখিয়া বাঙ্গালী লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। 'ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিহরি' গামছা দিয়া বিস্তর মাছ ধরিয়া বাসায় রাঁধিবার জন্য পাঠাইয়া দিলাম। পরে সপ্তধারা কুণ্ডে এবং ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম এবং প্রথমে উত্তম রূপে জলযোগ করা গেল, পরে বেলা তিনটার সময় খিচুড়ি খাওয়া গেল। আহারান্তে অল্পমাত্র বিশ্রাম করিয়া আমরা পর্ব্বতারোহণে বহির্গত হইলাম।

"বৈভারো বিপুলশ্চৈব রত্নকূট গিরিব্রজ, রত্নাচল ইতিখ্যাতা পঞ্চইতি পবনা নগা।" দেখিলাম, সেই গিরিব্রজপুরের উত্তরে বৈভারগিরি এবং বিপুলাচল, দক্ষিণে গিরিব্রজগিরি, মধ্যে রত্নাচল এবং রত্নকূট বা রত্নগিরি পর্ব্বতমালা অচল অটলভাবে দণ্ডায়মান; দেখিলাম, পূর্ব্বদিক্ বিপুল এবং তৎসংলগ্ন রত্নগিরি বা রত্নকূট পর্ব্বত প্রাচীরে, পশ্চিমদিক্ বৈভারের একাংশ চক্রানামক পর্ব্বতে, দক্ষিণ গিরিব্রজগিরির উন্নত শিখর মালায় এবং উত্তরদিক্ বিপুলাকায় বিপুল এবং বৈভারের অভেদ্য পর্ব্বত প্রাচীরে সুরক্ষিত। ঐ বৈভার এবং তৎসন্নিহিত রত্নাচল পর্ব্বত মধ্যস্থিত উপত্যকা ভূমিতেই জরাসন্ধের রাজপ্রাসাদ ছিল, এবং তাহা হইতেই গিরিব্রজপুরের আধুনিক নাম রাজগৃহ হইয়াছে। 'রাজগৃহে' প্রবেশ করিবার চারিটি দ্বার ছিল। প্রথম, বিপুল ও বৈভারের মধ্যস্থিত গিরিসঙ্কটে, দ্বিতীয় গিরিব্রজগিরির মধ্যস্থিত গিরিসঙ্কটে, তৃতীয় গিরিব্রজগিরি এবং রত্নকূট বা রত্নগিরির মধ্যস্থিত ভুমিতে এবং চতুর্থ বোধহয় রত্নাচল এবং বৈভারের অংশ চক্রার মধ্যে'। উপরোক্ত পর্ব্বতমালার উচ্চতম স্থল ১০০০ ফিটের অধিক হইবে না। হান্টার সাহেবের মতে এই পর্ব্বতরাশির প্রস্তর ইগিনিয়স্। ঐ সকল পর্ব্বতমালায় গৃহনির্ম্মাণোপযোগী প্রস্তর স্লাব, কিম্বা বাসনপত্রাদি তৈয়ার হইবার মত প্রস্তর পাওয়া যায়, এমন বোধ হইল না। পর্ব্বতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষরাজিতে আচ্ছাদিত এবং ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্রক জন্তুর আবাসস্থল। আমাদের বাসস্থান পুর্ব্বোক্ত বৈভারগিরির পাদদেশেই অবস্থিত ছিল। সেই ইন্সপেক্সন্ বাঙ্গালার পশ্চিমে আম্রকানন, পূর্ব্বে ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী সরস্বতী কলকলনাদে বহিয়া চলিয়াছে, উত্তরে বৌদ্ধের সমসাময়িক নৃপতি অজাতশত্রুর পিতা বিম্বসার-নির্ম্মিত দুর্গ প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ, এবং দক্ষিণে উন্নতশিখর বৈভারগিরি।

সপ্তপর্ণী গুহার উদ্দেশে এখন

সোমবার সন্ধ্যাঃ- আজি আমাদের প্রথম পর্ব্বতারোহণ। কেহ বা কোট্ পেন্টুলান পরা নেকটাই বাঁধা পুরা সাহেব; কেহ বা ধূতি ওভারকোট্ আঁটা আধ বাঙ্গালী আধ ইংরাজ; আবার কেহ ফুল মোজা পায়, গায় শাল, হাতে সৌখিনী ছড়ি, ধূতি পরা ফুলবাবু। এইরূপে বিচিত্র বেশ ভূষা করিয়া বেলা চারিটার সময় বিপুলাচল আরোহণার্থ বহির্গত হইলাম, সঙ্গে গাইড নাই, নিজেই নিজের পথ প্রদর্শক হইয়া পর্ব্বতের পাদদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাদের জনৈক স্থূলকায় বন্ধু পর্ব্বতারোহণ দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়া পশ্চাদ্‌পদ হইলেন। তাঁহার নেকটাই বাঁধাই সার হইল। আমরা পর্ব্বতে উঠিতে লাগিলাম, তিনি ম্লান মুখে একাকী ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে ফিরিলেন। দেখিয়া দুঃখও হইল, হাসিও আসিল। আমরা আন্দাজি একটি পথ ধরিয়া উঠিতে লাগিলাম; কিছু দূর উঠিতে না উঠিতে ঘাম ছুটিতে লাগিল, কেহ ওভারকোট্ খুলিলেন, কেহ রেপার ফেলিলেন, কেহ বা কোট কমফর্টার ফেলিয়া রাখিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। প্রায় তিন শত ফুট উপরে উঠিয়া আমরা একটী জৈন মন্দির দেখিতে পাইলাম, এখানে আসিতেই সূর্য্যাস্ত হইল, কিন্তু সেখান হইতে গিরিব্রজপুরের ভালরূপ দৃশ্য পাওয়া গেল না, ক্রমে আরও উপরে উঠিয়া আর একটি ক্ষুদ্র মন্দির দেখিলাম, তাহাতেও আশ মিটিল না, আরও কিঞ্চিৎ উপরে উঠিলাম। সেখানে এক প্রাচীন দুর্গ প্রাচীর-স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইলাম। অবশেষে সমাগত সন্ধ্যা দেখিয়া নামিতে লাগিলাম। ধরণী আঁধারের ধূসর বেশ পরিয়াছে, অচেনা পথ ক্ষুদ্র বৃক্ষ ও গুল্মলতাদিতে আচ্ছন্ন; যাহা হউক, সাহসে ভর করিয়া নামিতে লাগিলাম। ক্রমে অন্ধকার গাঢ়তর হইতে লাগিল, দুর্ব্বল বাঙ্গালীর সকল সাহস লোপ পাইল। কেহ হরি হে! বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন, আবার কেহ বা "কুছ পরওয়া নাহি" বলিয়া দ্রুতবেগে নামিতে লাগিলেন। পথে উঠিবার সময় যে সকল বস্ত্রাদি ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছিলাম, তাহা নামিবার সময় পথ-প্রদর্শনের অনেক সহায়তা করিল। কিছু দূর নামিয়া আসিয়া আমাদের মধ্যে দুই জন অপথে গিয়া পড়িলেন, দেখিলেন আর যাইবার পথ নাই, তাঁহারা সেইখান হইতে আমাদের সাবধান করিয়া দিলেন, এবং ফিরিয়া আসিয়া সকলে একসঙ্গে নামিতে লাগিলাম। হিল্‌ওয়ালা জুতা পিছলাইয়া যাইতে লাগিল, কেহ বা বাহাদুরি করিয়া শিলা খণ্ডের মধ্যস্থিত সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া নামিতে গিয়া পড়িয়া গেলেন। যাহা হউক, কোন ক্রমে তো ভালয় ভালয় সে রাত্রে আমরা বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। সন্ধ্যাকালে পর্ব্বতারোহণের যথেষ্ঠ কষ্ট ভোগ করিলাম। কিন্তু গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম যে, আমাদের পূর্ব্বোক্ত স্থূলকায় বন্ধুটী সকলের জলযোগের বিশেষ আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন। কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া একটু তাস খেলা গেল। পরে পরামর্শ হইল যে, পরদিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া একদিনে সমস্ত গিরিব্রজ দেখিতে হইবে, এবং পাণ্ডাকে ডাকিয়া বলিয়া দেওয়া হইল যে, সে যেন খুব সকাল সকাল আসে।

মঙ্গলবারঃ- রাত্রে আমরা সুখে নিদ্রা গিয়া ভোর পাঁচটার সময় সকলে উঠিলাম, উঠিয়া দেখি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন --- অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে, প্রবল বেগে বাতাস বহিতেছে, কিন্তু বঙ্গীয় যুবক এ সামান্য বাধায় পশ্চাদ্‌পদ হইবার নয়। ছাতা মাথায় দিয়া মাঠে প্রাতঃক্রিয়া সমাপন করা গেল। বাসায় আসিয়া কেহ বা ইংরাজী মতে, কেহ বা আধ হিন্দু আধ ইংরাজি মতে, এবং কেহ বা হিন্দু মতে, জলযোগ করিয়া বেলা ৭টার সময় গিরিব্রজপুর দর্শনার্থ বহির্গত হইলাম। আমাদের মধ্যে দু একজন অনাহারেও রহিলেন, আমরা পকেটে হিন্দু বিস্কুট লইলাম।

আমরা বিপুল এবং বৈভারের মধ্যবর্ত্তী গিরিপথ দিয়া গিরিব্রজপুরের প্রবেশ করিলাম। দক্ষিণে বৈভার, বামে বিপুলাচল, এই গিরিপথেই জরাসন্ধের জরারাক্ষসী রক্ষীত সূর্য্যদ্বার ছিল, তাহার চিহ্ন আজও লক্ষিত হয়।

বিপুলাচল --- লোকে বলে বিপুলাচলই মহাভারতের চৈত্যক পর্ব্বত। বিপুলাচলের পাদদেশে সর্ব্বশুদ্ধ ছয়টি উষ্ণপ্রস্রবণ দেখিলাম, উহার মধ্যে পশ্চিম-উত্তর পাদদেশে স্থিত মকদুমকুণ্ড বা শৃঙ্গীঋষি-কুণ্ড সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বে শৃঙ্গীঋষি এইস্থানে অবিস্থিতি করিতেন, পরে মুসলমানেরা ঐ স্থান অধিকার করিলে মকদুম্ সাহ সেখ্ সরিফ্‌উদ্দিন আহমেদি এহিয়া নামক জনৈক প্রসিদ্ধ মুসলমান ফকির ৭১৫ হিজারিতে তথায় আসিয়া বাস করেন, এবং তাঁহা হইতেই ঐ শৃঙ্গীঋষিকুণ্ডের নাম মকদুমকুণ্ড হইয়াছে। তাঁহার প্রকৃত নাম সরিফউদ্দিন, পিতার নাম আহমদ্ এহিয়া, জাতিতে সেখ্, বাসস্থান পাটনার নিকটবর্ত্তী মনের গ্রামে, তিনি সাহ বা উদাসীন ছিলন, এবং তিনি সকলের সেবনীয় ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে মকদুম্ বলিত।

মকদুমকুণ্ড --- মকদুমকুণ্ড চতুর্দ্দিক উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত, কুণ্ডের পরিসর ছয় হাত দীর্ঘ এবং প্রায় পাঁচ হাত প্রস্থ হইবে। ৺অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয়ের চারুপাঠ প্রথম ভাগে পড়িয়াছিলাম "স্থানে স্থানে ভূমণ্ডলের অভ্যন্তর হইতে যে জলপ্রবাহ নির্গত হয়, তাহা প্রস্রবণ। যে সকল প্রস্রবণের জল স্বভাবতঃ সর্ব্বদা উষ্ণ থাকে, তাহার নাম উষ্ণপ্রস্রবণ।" কিন্তু মকদুমকুণ্ডের জল ভূগর্ভোত্থিত নয়, পর্বত গাত্র হইতে স্বভাবতঃ সর্ব্বদা উষ্ণজল নির্গত হইতেছে। বাহির হইতে সে স্থানটি দেখিবার যো নাই; তবে এইমাত্র দেখিলাম যে, প্রস্তর-নির্ম্মিত একটী নল দিয়া কুণ্ডেতে নাতি উষ্ণ জল পড়িতেছে। কুণ্ড মধ্যে সদা সর্ব্বদা আড়াই হাত তিন হাত জল বদ্ধ থাকে, অতিরিক্ত জল পয়োনালা দিয়া বাহিরে বহিয়া যাইতেছে। কুণ্ডের সংলগ্ন একটি মসজিদ্ আছে, মসজিদের বহির্প্রাঙ্গণে বড় বড় বৃক্ষ; ভিতরের প্রাঙ্গণ ইষ্টক প্রাচীরে বেষ্টিত। এই প্রাঙ্গণের পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে মকদুম সাহের চিল্লা অর্থাৎ পর্ব্বতগুহা দেখিলাম। এই খানে বসিয়া মকদুম সাহ নিত্য উপাসনা করিতেন। গুহাটি ক্ষুদ্র, উহার প্রবেশ পথের উপরিভাগে একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড নিম্নদিকে লম্বমান। তথাকার মুসলমান গুহারক্ষক বলিলেন, এক সময় মকদুম সাহ একান্বয়ে চল্লিশ দিন উপবাস করিয়া এই গুহা মধ্যে তপস্যা নিরত হন। হিন্দুদৈত্যেরা, হিন্দুগুহা যবনাধিকৃত এবং হিন্দুর কঠোর তপস্যা যবন কর্ত্তৃক পরাভূত হইতে চলিল দেখিয়া, ঐ প্রস্তর খণ্ড দ্বারা গুহাদ্বার রুদ্ধ করিয়া মকদুম সাহকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলেন, মকদুম সাহের সহসা ধ্যানভঙ্গ হইল, তিনি একবার উপর দিকে দেখিলেন, প্রস্তর খণ্ড সেই অবস্থায় রহিয়া গেল, আর পড়িল না। সে দিন হইতে আজি অবদি উহা ঐ অবস্থায় রহিয়াছে। এই চিল্লার কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে দক্ষিণদিকে মকদুম সাহের নিত্য নিমাজের স্থান যত্ন সহকারে রক্ষিত রহিয়াছে দেখিলাম। মকদুমকুণ্ড আজি বিহারের মধ্যে মুসলমানদিগের একটি পবিত্র তীর্থস্থান। বহু সংখ্যক নরনারী এই কুণ্ডে স্নানার্থ আসিয়া থাকেন। যাঁহাদের কোন মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে, তাঁহারা মকদুমকুণ্ডে স্নানান্তে আপনাদিগের পরিধেয় বস্ত্রের একাংশ ছিন্ন করিয়া উপরোক্ত গুহাদ্বারের দুইপার্শ্বে দোলায়মান চামরে বাঁধিয়া দেন; দিন দিন চামর দুইটি নানা বর্ণের ফালিতে পরিপূর্ণ হইয়া আয়তনে বাড়িতেছে। মকদুমসাহ হিন্দুদিগেরও মাননীয় ছিলেন, আজও অনেক হিন্দু তাঁহার চিল্লা দর্শনার্থ গিয়া থাকেন, এবং রাজগিরির পাণ্ডারা হিন্দুদিগের দত্ত পয়সার অংশও পাইয়া থাকেন। আমরা যে দিন মকদুমকুণ্ড দেখিতে যাই, সেদিন জনৈক মুসলমান জমিদার স্ত্রীপুত্রাদি সমভিব্যাহারে মকদুমকুণ্ডে স্নানার্থে আসিয়াছিলেন। পুরুষেরা তাঁবুর ভিতরে, এবং স্ত্রীলোকেরা উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত অঙ্গনের মধ্যে অবস্থিত দেখিলাম, বহির্প্রাঙ্গণে পোলাও কালিয়া তৈয়ার হইতেছিল। কুণ্ডের নিম্নদেশে সমতল ভূমিতে অনেকগুলি মুসলমান পিরের কবর দেখিলাম। মুসলমান দিগের অধিকার কালে এখানে যে প্রসিদ্ধ বিদ্যালয় ছিল, সে গৃহের ভগ্নাবশেষ এই কবরগুলি হইতে উত্তরে অবস্থিত, এক্ষণে কেবল দু তিনটি পাথরের থাম অবশিষ্ট রহিয়াছে।

মকদুমকুণ্ডের কিঞ্চিৎ পশ্চিম-দক্ষিণে অন্য পাঁচটি উষ্ণপ্রস্রবণ, যথা, সীতাকুণ্ড, রামকুণ্ড, গণেশকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড এবং সোমকুণ্ড। ইহাদের মধ্যে কোনটির জল মকদুমকুণ্ডের জলের অপেক্ষা উষ্ণতর, কোনটির বা জল অপেক্ষাকৃত শীতল। এই পঞ্চকুণ্ডের জল ভূগর্ভোত্থিত। হিন্দু এবং জৈন উভয়েই এই সকল কুণ্ডে স্নানাদি করিয়া থাকেন। এই পঞ্চকুণ্ডের পাশ দিয়া আমরা পূর্ব্বদিন বিপুলাচলে উঠিয়াছিলাম। বৈভারাচলের পাদদেশে যে সকল কুণ্ড এবং পর্ব্বরোপরি যে সকল মন্দিরাদি দেখিয়াছিলাম, তাহার বিবরণ পরে দিব। এক্ষণে বৈভার এবং তৎসম্মুখীন রত্নাচলের মধ্যবর্ত্তী উপত্যকা ভূমিতে অর্থাৎ জরাসন্ধের রাজগৃহে যাহা দেখিলাম, তাহার বিষয়ে দু একটী কথা বলিতে চাহি। আমরা বৈভার গাত্রস্থিত কুণ্ডের নিম্নদেশ দিয়া ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী সরস্বতীর কূলে কূলে দক্ষিণাভিমুখে চলিলাম, কিছু দূর গিয়াই এক শ্মশানে উপস্থিত হইলাম। 'রাজগৃহের' প্রবেশদ্বারে, পার্ব্বত্য নদীকূলে সেই শ্মশানভূমি দেখিয়া মনে হইল, রাজচক্রবর্ত্তী জরাসন্ধের সমৃদ্ধিশালিনী 'রাজগৃহ' আজি যে শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, তাহারি নিদর্শনচিহ্ন বুঝি বৈভারের পূর্ব্বাঙ্কে অঙ্কিত রহিয়াছে। আমরা শ্মশানভূমি অতিক্রম করিয়া নাতিদূরে একটি উচ্চস্থানে জরারাক্ষসীর* মন্দির দেখিতে পাইলাম। পাণ্ডা বলিলেন জরা রাক্ষসী উত্তর দ্বারের রক্ষয়িত্রী ছিল বলিয়া তাঁহার মন্দির এইখানে স্থাপিত হইয়াছে।

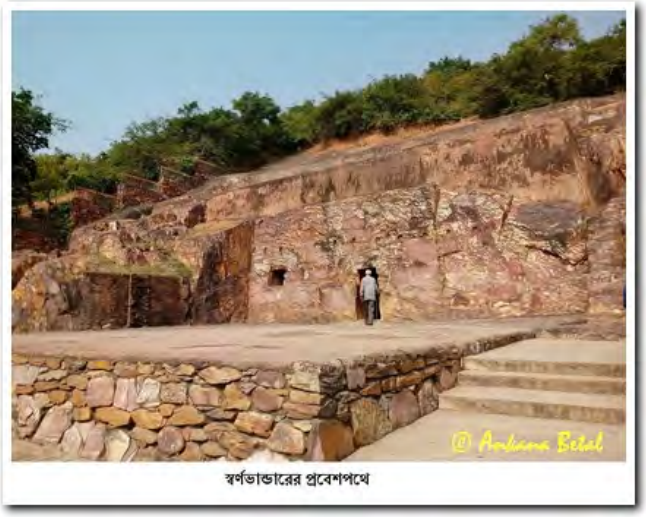

স্বর্ণভাণ্ডারের প্রবেশপথে

আমরা এখান হইতে পশ্চিমাভিমুখে বনপথ দিয়া 'শূন্যভাণ্ডার', 'জরাসন্ধের আখাড়া' প্রভৃতি স্থান দেখিতে চলিলাম। পথ সঙ্কীর্ণ, বন গুল্ম লতাদিতে স্থানে স্থানে অবরুদ্ধ, সূর্য্যদেবও প্রখর কিরণে উদিত হইলেন দেখিয়া আমরা ওভারকোট প্রভৃতি ভারি কাপড় চোপড় খুলিয়া ফেলিলাম, জনৈক রাখাল সেই পথে যাইতেছিল, আমাদের পাণ্ডার কথামত সেই সকল কাপড় তাহাকে আমাদের বাসায় রাখিয়া দিবার জন্য দিলাম, এই খানেই বলিয়া রাখি, আমরা বাসায় ফিরিয়া আসিয়া সে সমস্তই পাইয়াছিলাম। আমরা আধক্রোশ আন্দাজ গিয়া বৈভারাচলের দক্ষিণাঙ্কে একটি মনুষ্য-খোদিত গিরিকক্ষ দেখিতে পাইলাম। পাণ্ডা বলিলেন, ইহারই নাম 'শূন্যভাণ্ডার'। এই গিরি কক্ষটি চতুষ্কোণ, দৈর্ঘে ১১ হাত, প্রস্থে ৬ হাত, এবং মধ্যস্থলের উচ্চতা ৪ হাত হইবে। কক্ষ দক্ষিণ দ্বারী, দক্ষিণ দিকের দেওয়াল প্রায় আড়াই হাত মোটা; প্রবেশ দ্বার ৪ হাত উচ্চ এবং ২ হাত প্রশস্ত, প্রবেশ দ্বারের বামদিকে একটি গবাক্ষ উহা উচ্চ ২ হাত, প্রস্থে ১॥ হাত। ঐ কক্ষের ভিতরের এবং বাহিরের দেওয়ালে খোদিত অক্ষর সকল দেখিলাম কিন্তু পড়িতে পারিলাম না। গিরিকক্ষের উত্তর দিকের দেওয়ালের পশ্চিম ভাগে একটি লম্বা ফাটা দাগ দেখাইয়া আমাদের পাণ্ডা বলিলেন যে, ইহারই পশ্চাতে জরাসন্ধের স্বর্ণভাণ্ডার ছিল। ইংরাজ গোলাগুলি মারিয়া এই দরজা ভাঙিতে পারেন নাই। সহসা দেখিলে বোধ হয় বটে যে পূর্ব্বে ঐ খানে একটি দ্বরজা ছিল, পরে কেহ বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড দ্বারা উহা বন্দ করিয়া দিয়াছে, কিন্তু আমার বিবেচনায় উহা পর্ব্বত গাত্রে একটি ফাটমাত্র। এই কৃত্রিম গিরিকক্ষ যে এক সময়ে উত্তম রূপে প্লাসটার করা ছিল, এবং উহার বর্হিদ্দেশে বারাণ্ডা ছিল, তাহার চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। কক্ষমধ্যে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিখোদিত এক ভগ্ন প্রস্তর খণ্ড দেখিলাম। এই কক্ষের অন্য নাম সোণ-ভাণ্ডার, বোধহয় স্বর্ণভাণ্ডার বা সোণাভাণ্ডারের অপভ্রংশ মাত্র। ইহার নাম শূন্যভাণ্ডার বা সোন্-ভাণ্ডার যে কেন হইল, তাহার কোন বিশেষ পরিচয় পাইলাম না, উহা যে কোন সময়ে ধনাগার ছিল, তাহারও কোন চিহ্ন দেখিলাম না। আমাদের মধ্যে কেহ বলিলেন, এই কক্ষেই বুদ্ধদেব ধ্যানস্থ ছিলেন, এই কক্ষে বসিয়াই তাঁহার শিষ্যগণ বৌদ্ধধর্ম্মের আদি নীতিমালা সঙ্কলন করিয়াছিলেন, ইহাই সেই 'উরু বিল্ব' কক্ষ; কেহ বলিলেন, এই সেই সপ্তপানি গুহা; আবার কেহ বলিলেন, এই খানেই বুঝি জরাসন্ধের প্রসিদ্ধ কারাগার ছিল। যাহার যা মনে আসিল, তিনি তাহাই বলিলেন; আমরা এ তর্ক বৃথা দেখিয়া জরাসন্ধের আখাড়া দেখিবার জন্য পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। কিছুদূর গিয়া দেখিলাম, এক প্রশস্ত সমতল ভূমিখণ্ডের চতুর্দ্দিকে লাল মৃত্তিকা এবং প্রস্তর মিশ্রিত উচ্চ প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ এবং প্রাচীরের চতুর্দ্দিকে সরস্বতী নদী প্রবাহমানা। কেহ বলিলেন, এইখানে জরাসন্ধের অন্তঃপুর ছিল, কেহ বলিলেন শূন্যভাণ্ডার নয়, ইহাই জরাসন্ধের সেই কারাগার ---- যেখানে জরাসন্ধ রুদ্রদেবের পূজার্থ 'অশিতি নৃপতি জিনি ভুজবলে রেখেছিল বন্দী করি কারাগারে'। আমাদের পাণ্ডা এ বিষয়ে কিছুই বলিতে পারিলেন না। তৎপরে শূন্যভাণ্ডার হইতে আধক্রোশ পশ্চিমে গিয়া বৈভারের পাদদেশে সেই ভারত খ্যাত রঙ্গভূমি --- সেই জরাসন্ধের আখাড়া নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। পাণ্ডা বলিলেন, জরাসন্ধ নিত্য এই স্থানে মল্লযুদ্ধ করিতেন, এবং ভীমের সহিত এইখানে জরাসন্ধের ১৩ দিন মল্লযুদ্ধ হয়, ইষ্টকের চূর্ণরাশি দেখাইয়া বলিলেন, দেখুন রক্তচিহ্ন এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই স্থানটুকুর বিশেষত্ব এই যে, সেই শৈল -উপত্যকার বন্ধুর উপলরাশির মধ্যে ইহাই একমাত্র মসৃণ মৃত্তিকাময় স্থান; নিম্নে রাঙ্গামাটি, উপরে এক ফুট আন্দাজ ভাঁটা মাটির মত মসৃণ এবং শ্বেতাভ মৃত্তিকায় আচ্ছাদিত, একবিঘা জমি প্রায় এইরূপ। এক সময়ে যে এই আখাড়ার চতুর্দ্দিকে গৃহাদি ছিল, তাহারও নিদর্শন দেখিলাম। একস্থানে দেখিলাম, ইষ্টকরাশি সহস্রাধিক বৎসর প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে, কিন্তু ছুইলেই গুঁড়া হইয়া যায়। আমরা ঐ ইষ্টক চূর্ণ এবং আখাড়ার শ্বেত মৃত্তিকা লইলাম, প্রবাদ যে, জরাসন্ধের আখাড়ার মাটি মাখিলে লোকে সবলকায় হয়। এই আখাড়ার পশ্চিমে আর কিছু দর্শনীয় স্থান আছে কিনা, পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি বলিলেন, আর কিছুই নাই; কিন্তু আমরা দেখিলাম, দূরে বৃক্ষাচ্ছাদিত মৃত্তিকা প্রাচীরে পরিবেষ্টিত তিন চারিটি স্থান রহিয়াছে, জানিনা, তথায় কিছু দর্শনীয় বস্তু আছে কি না, কিন্তু পশ্চিমদিকের বন গাঢ়তর এবং দূরতা বশতঃ আমরা আর পশ্চিমদিকে না গিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। এই উপত্যকা ভূমির প্রায় মধ্যাভাগে যে একটি তড়াগ ছিল, তাহার কিঞ্চিৎ অংশ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই তড়াগের পূর্ব্বদিকে একটু উচ্চস্থানে একটি মন্দির এবং কূপ দূর হইতে দেখিতে পাইলাম, পাণ্ডা বলিলেন উহার নাম 'নির্ম্মাণকূপ', কিন্তু উহা কবে নির্ম্মিত হইল এবং কেই বা নির্ম্মাণ করিল, তাহার বিষয় কিছুই বলিতে পারিলেন না। আমাদের বোধ হইল, উহা কোন বৌদ্ধকীর্ত্তি হইবে।

পথ দুর্গম এবং বেলা প্রায় ১০টা বাজিয়াছে দেখিয়া আমরা উহা দেখিতে গেলাম না। রাজগৃহ উপত্যকা দেখা এইখানে শেষ করিলাম।

স্বর্ণভান্ডারের প্রাচীরগাত্রে

রাজগৃহ আজি বনগৃহে পরিণত দেখিলাম, সে উপত্যকা ভূমি স্থানে স্থানে যে দৃঢ় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল, তাহার ভগ্নাবশেষ আজি বনবৃক্ষাচ্ছাদিত, রাজপ্রাসাদাদি ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে, তবু সেই পাষাণময় অট্টালিকার প্রস্তররাশি স্থানে স্থানে স্তূপাকার রহিয়াছে, বৈভারাঙ্কে বাসস্থানার্থ যে সকল স্থান পরিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহার ক্ষীণ চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। আমরা এখান হইতে গিরিব্রজপুরের দক্ষিণ দ্বার দেখিতে চলিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গিরিব্রজপুর দক্ষিণ দিকে গিরিব্রজগিরি দ্বারা রক্ষিত। এই গিরিব্রজগিরির মধ্যভাগে যে গিরিসঙ্কট, তথায় 'গজদ্বার' নামক রাজগৃহ প্রবেশের দক্ষিণদ্বার ছিল। পূর্ব্বোক্ত বৈভার এবং বিপুলের মধ্যবর্ত্তী 'সূর্য্যদ্বার' হইতে ঐ গজদ্বার অবধি যে বিস্তৃত রাজপথ ছিল, আজও লোকে সেই পথ অনুসরণ করিয়া যাতায়াত করিয়া থাকে; সর্ চার্লস ইলিয়টের আগমনোপলক্ষে এই পথের স্থানে স্থানে জীর্ণ সংস্কার হইয়াছিল। আমরা শীঘ্র ঐ রাজপথ ধরিবার জন্য অপথ দিয়া, বনের ভিতর দিয়া চলিলাম, যাইতে যাইতে কেহ সুন্দর বনফুলে দেহ সজ্জিত করিলেন, কেহ বনকুল তুলিয়া খাইলেন, আমাদের কবিরাজ মহাশয় কুঁচ, কুরচি প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধি সংগ্রহ করিতে লাগিলে। আমরা এইরূপে কতদূর অপথে গিয়া পূর্ব্বোক্ত রাজপথে পড়িলাম, বন কন্টকাদিতে বস্ত্রাদি ছিন্ন হইল, কাহারও বা দেহ ক্ষত বিক্ষত হইল। প্রায় একক্রোশ দক্ষিণাভিমুখে গিয়া আমরা গিরিব্রজগিরির পাদদেশে পথপার্শ্বে এক প্রকাণ্ড কূপ সন্নিকটে বৃক্ষতলে অল্প বিশ্রাম লাভ করিলাম। পরে আরও কিঞ্চিৎ দক্ষিণাভিমুখে গিয়া পথের উপরে বামধারে প্রস্তরে বিচিত্রভাষায় খোদিত শ্লোকাদি দেখিলাম। বঙ্গেশ্বর ইলিয়ট বাহাদুর যাহাতে ঐ সকল চিহ্নাদি লোকের চলাচলে বিনষ্ট না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। আমরা এখান হইতে পশ্চিম-দক্ষিণাভিমুখে কিছু দূর গিয়া গিরিব্রজ গিরিমধ্যস্থিত গিরিসঙ্কটে উপস্থিত হইলাম। ইহার কথা পরে বিবৃত করিব।

(ক্রমশঃ)

*জরারাক্ষসী এবং জরাসন্ধের বিস্তৃত বিবরণ মহাভারতের সভাপর্ব্বের সপ্তদশ অধ্যায় এবং পরবর্ত্তী অধ্যায় সকলে দেখুন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ হিতেশরঞ্জন সান্যাল মেমোরিয়াল আর্কাইভ

জরাসন্ধের আখড়া থেকে আজকের রাজগিরের দৃশ্য

[লেখার বাকী অংশ পরের সংখ্যায়। মূল বানান ও বিন্যাস অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। - সম্পাদক]

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00
Like Be the first of your friends to like this.
tell a Friend

ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনি - চতুর্থ পর্ব

আগের পর্ব - তৃতীয় পত্র

ভ্রমণকারী বন্ধুর পত্র - লাদাখ পর্ব

দময়ন্তী দাশগুপ্ত

~ *লাদাখের আরও ছবি* ~

চতুর্থ পত্র

বন্ধুবর,

মাঝে পত্র দিতে পারিনি, শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না, খবরটা পেয়েছ বোধহয়। আর এই মূহূর্তে মন একেবারে ভালো নেই। আজ তোমাকে যখন বুদ্ধের দেশের গল্প বলব, তখন আর এক বুদ্ধের দেশ মায়ানমার থেকে প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে আসছে রোহিঙ্গা শরণার্থীরা। আর আমাদের এই 'ধর্মনিরপেক্ষ দেশ'-এ ধর্মের উন্মাদনার বিরুদ্ধে কলম ধরার জন্য নিহত হচ্ছেন গৌরীরা।
এ কোন পৃথিবীতে বেঁচে আছি বলো তো?
এই জন্যই তো বারবার ফিরে আসি প্রকৃতির কাছে। প্রকৃতিই আমার প্রকৃত শিক্ষক। মানুষ কেবল লোভের বশে তাকে ধ্বংস করতে করতে নিজের মৃত্যু তরান্বিত করে। আসলে প্রকৃতির রাজ্যে মানুষই একমাত্র খিদে ছাড়া অন্যকে মারে। তার একটাই খিদে - লোভ। যার লক্ষ্য ক্ষমতা এবং মুখোশ অথবা হাতিয়ার ধর্ম।
আমাদের এবারের গন্তব্য লাদাখ পাহাড়ের আর এক লেক সো মোরিরি। আর এই পথের সব থেকে আকর্ষণ আমার কাছে লেগেছিল সেই ছেলেবেলার ইতিহাসের সিন্ধুনদের পাশ দিয়ে যাওয়া। বলছি দাঁড়াও।

১৮/১০/২০১৫
সকাল সোয়া আটটা, লেহ
সো মোরিরির দিকে রওনা। আজও ঝকঝকে সকাল। তবে দীপের শরীরটা খারাপ, হাঁপ ধরছে মাঝেমাঝে। কারু অবধি একই রাস্তা দিয়ে যাওয়া। 'কানট্রি রোডস টেক মি হোম' - মোবাইলে বাজছিল। বাইরে অনাবিল প্রকৃতি; পাহাড়, নদী আর গাছের রঙে। প্রকৃতির সীমাহীন অনন্ত রাজ্যে দেশ নামক সীমারেখা বসিয়েছে মানুষ। আর প্রকৃতিকে ধ্বংস করে গড়ে তুলেছে নগর - তার বাসস্থান। আসলে দেশ বা বাসভূমি সত্যি কি ভিন্ন ভিন্ন হয়? ওই যে পাহাড়ের গায়ে যে রঙিন বাড়িটা দেখা যাচ্ছে দূরে, অনেকটা দূরে, ওর মধ্যেও তো এক চেনা গেরস্থালি আছে মানুষের; সেও কি আমার আপনজন নয়?
বাইরের দৃশ্য দেখলে ঠিক বিদেশি সিনেমার কোনও পটভূমির ভেতর দিয়ে চলেছি মনে হচ্ছে। পথের পাশে একটা ইয়াক চোখে পড়ল। নীল আকাশে ম্যাজিক কার্পেটের মতো এক খণ্ড মেঘ।

সিন্ধুর পাশে পাশে চলা। কেবল মনে হচ্ছে গাড়ির থেকে নেমে দু দণ্ড ওর পাশে বসে একটু গল্প করে আসি। সে যে আমার কতকালের চেনা আপনজন। অথচ এই প্রথম দেখা। তাই যেন দেখে দেখে আশ মেটে না আর।

সোয়া নটা, উপসি
সিন্ধুর গাঘেঁষা জমিতে লাল হলুদ ঝোপের মতো গাছ, যেন তার নীল শাড়ির ঝলমলে পাড়। আবার রুক্ষ্ম পাহাড়ের গায়ে এসে নিজেই রঙ বদলায় সে; এবারে গাঢ় সবুজ আর বহরেও চওড়া বেশ। এক জায়গায় স্রোতের বেগ খুব। বর্ষায় সিন্ধু প্রবল রূপ ধরে ভেঙে দিয়েছিল মানুষের বানানো পথ। চলেছি নতুন বানানো কাঁচা পথে ঝাঁকুনি খেতে খেতে। ডান হাতে সিন্ধুকে রেখে। হলুদ পাহাড়ের ছায়া পড়েছে তার

নীল-সবুজ জলে। ডানদিকের পাহাড়ে প্রকৃতির আপন স্কাল্পচার আর বাঁদিকের পাহাড়ের গায়ে মাঝে মাঝে লেগে রয়েছে সবুজ ঘাসের গুচ্ছ।

পৌনে দশটায় লিস্টসে পেরোনো। মাঝে মাঝে সেই লাল-হলুদ-সবুজ গাছেদের ভিড়। আবার কখনও ঘাসে ছাওয়া কখনওবা একেবারেই নেড়া পাহাড়। সিন্ধু সঙ্গী সততই। পথের পাশে কোথাও নজরে পড়ে পাহাড়িয়া জীবনের নিত্যদিনের কর্মব্যস্ততার এক ঝলক। সেখানে জলসংগ্রহের কাজে বাপের সঙ্গী ছোট্ট ছেলেও। এর ঠিক পরেই তারচিক থেকে শুরু হল ব্রিজ পেরোনো। তিনটে ব্রিজ পেরিয়ে রানিডাগ-এ। এখানে থ্রি ইডিয়টসের শুটিং হয়েছিল। অতএব 'অল ইজ ওয়েল।' এবারে বাঁদিকে সিন্ধুকে রেখে এগিয়ে চলি আমরা। হায়ামিয়াতে ব্রিজ পেরিয়ে আবার নদীর ওপারে।

পৌনে এগারটা, তিরি গ্রাম

এখনও পর্যন্ত সিন্ধু ডান হাতেই রয়েছে। তার গা ঘেঁষে রঙিন গাছপালার বাহার বেড়েছে। গতকাল বরফের গায়ে রোদ্দুর পড়ে ক্রিস্টালগুলো চিকচিক করছিল। আজ নদীর জলে রোদ ঝিকমিক করছে। তবে লিখতে খুব আলসেমি লাগছে... ক্লান্ত।

আরও চার কিলোমিটার পরে গাইক গ্রাম। পথে বেশ কটা পাহাড়ি মোনাল চোখে পড়ল। এখন সিন্ধুর কোল থেকে অনেকটা ওপরে উঠে এসেছি।

সোয়া এগারটা, কিয়ারি

মিলিটারি এলাকা দিয়ে যাচ্ছি এখন। ডানহাতে সিন্ধু। সিন্ধুর এপাড়-ওপাড় বরাবর কোথাওবা রঙিন ফ্ল্যাগ লাগানো। দুদিকেই এবার কালচে লাল রঙের পাহাড়। নদীর পাড়েও গাছের রঙ লাল। শুধু সিন্ধু একাই নীল। সিন্ধু নদী নয়, নদ। তবু নদী শব্দটা বেশি সুন্দর যে। তাই লেখায় সেটাই আসছে।

ডান হাতে লাল পাহাড়। বাঁ দিকে সবুজ আর কালো। কালো পাথরের গা ঘেঁষে লাল রঙের গাছেরা আলো করে আছে যেন। লাল ঝোপের পাশাপাশি সিন্ধুর তীরে হলুদ-সবুজ ঝোপেরাও ভিড় বাড়িয়েছে। আর সেই লাল-সবুজ গাছেদের ভিড়ে লাল-হলুদ চালের বাড়িগুলো যে কী মিষ্টি কী মিষ্টি। খালি মনে হচ্ছিল এক ছুট্টে চলে যাই অমন কোনো বাড়ির উঠোনে। কিন্তু আমরা যে এখানে কেবল যাত্রী-ই। যার সামনে শুধু বদলায় দৃশ্যপট।

পাহাড়ে এমনিতেই গাড়ির ড্রাইভারদের মধ্যে কম্পিটিশন হয় না। এখানে যেন তারা আরওই বন্ধু পরস্পরের। উলটো দিক থেকে গাড়ি এলে হয় দু-চার কথা বিনিময়, আর নয়তো নিদেনপক্ষে হাত নাড়া আর সেই চেনা সাদর সম্ভাষণ - 'জুল্লে।'

কালো পিচের মসৃণ রাস্তা। অফসিজনে পথে গাড়ির সংখ্যা খুব কম। মাঝে মাঝে এক-একটা মিলিটারি ট্রাক যাচ্ছে। লাল-সবুজ পাথরের পাহাড় দেখে মনে হচ্ছে কে যেন গুঁড়ো রঙ ছড়িয়ে দিয়েছে।

পৌনে বারোটা, কিদমা

সিন্ধু এখানে প্রচণ্ড - পাথরে পাথরে নেচে চলেছে। ডানদিকে কালো পাহাড়। বাঁদিকে পাহাড়ের রঙ অদ্ভুত; চন্দনদা বলল, পাথরের মধ্যে সোডিয়াম সিলিকেট আছে। আমার কৌতূহলের উত্তরে আরও জানালো, লাল পাহাড়ে ম্যাঙ্গানিজ বা কোবাল্ট, সবুজ রঙের পাহাড়ে ক্রোমিয়াম অথবা কপার। বাঁ দিকের পাহাড়ের রঙ বদলে বদলে যাচ্ছে। ডানদিকে ওই কালচে বা কালচে লাল রঙের পাহাড়ই দৃশ্যমান।

চুমাথাং পৌঁছে দুপুরের খাওয়া সারা হলো। এখানের হট স্প্রিং থেকে বোতলে করে গরম জল ভরে এনেছিল বীরেন। গাড়িতে বসে কোমরে সেঁক দিতে দিতে চলেছি। বাইরের দৃশ্য বদলে বদলে যাচ্ছে। ঘরের সামনে পাহাড়ের ধাপকাটা জমি পেরিয়ে তারের বেড়ার গায়ে দরজা। আর সেই দরজার বাইরের এক চিলতে ঘাসের মাঠে চড়ছে পোষা ঘোড়ার দল। কোথাওবা সিন্ধুর কোল ঘেঁষে এক চিলতে গ্রামের কয়েকখানা বাড়ি। এমন কত টুকরো টুকরো জীবনছবি।

সোয়া একটা, মাহে

সিন্ধু এখন বেশ চওড়া। তবে এপথে সিন্ধুর পাশে পাশে চলা এখানেই শেষ। নদী পেরিয়ে অন্য রাস্তা ধরলাম। এখন দুপাশেই শুধু পাহাড়। ডানদিকে তার রঙ লাল আর বাঁ দিকে কালো। লাল পাহাড়ের গায়ে লাল রঙের ছোট ছোট গাছের ঝাড়ও। কালো পাহাড়ের গায়ে কোথাও অল্প অল্প সবুজ ঘাস লেগে রয়েছে। হলুদ মসেরা উঁকি দিচ্ছে কালো পাথরের ফাঁকে ফাঁকে।

পৌনে দুটো, সুমদো

একটা বড়সড় স্কুল চোখে পড়ল। গোটা দুয়েক ঘোড়াও। ঘুঘুর মতো দেখতে তিনটে পাখি রাস্তা পেরোচ্ছিল।

সুমদোর পর অনেকটা মসে ঢাকা জমি পেরিয়েছি। পাহাড়ের গা বেয়ে উঠেও এসেছি অনেকটা। এখন একটা বিরাট মাঠে যেন, দূরে দূরে পাহাড় আর মাটির গায়ে হলুদ রঙের ঘাস। সামনে নীল-সবুজ জলের একটা লেক। কিয়াগার সো। হলুদ মাটি, পেছনে কালো-হলুদ পাহাড়ের গা কোথাও কোথাও বরফ জমে সাদা হয়ে আছে। ঝকঝকে নীল আকাশে সাদা মেঘের কারুকাজ। এক ঝাঁক পাখি উড়ে যাচ্ছে। যতদূর দেখা যায় - আর কেউ নেই, কিছু নেই - আমরা ছাড়া! অবিশ্বাস্য নির্জনতা।

কিন্তু মাথাটা খুব ধরেছে। ঠান্ডা না অক্সিজেনের খামতি?

মূল রাস্তা ছেড়ে গাড়িটা শর্টকাটে অনেকটা ওপরে উঠে এল বেশ তাড়াতাড়িই। পথের দুপাশে ছড়ানো হলুদ রঙের উপত্যকা। ডানপাশে ঘোড়ার একটা বড় দল চড়ছে। বাঁ দিকে বহুদূরে একটি মানুষ।

দুটো কুড়ি নাগাদ পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে প্রথমবার সো মোরিরিকে দেখা গেল।

অবশেষে পৌঁছালাম। 'সো' মানে হ্রদ সে তো জানাই আছে, 'মোরিরি' মানে পাহাড় - অর্থাৎ পাহাড়ি হ্রদ। নীল জলের সো মোরিরিকে দূর থেকে খুব চওড়া লাগছে না। জলে হালকা ঢেউ আছে। দূরের দিকটায় হাঁস ভেসে বেড়াচ্ছে। পেছনে অনেক দূরে বরফ পাহাড়। দুপাশে পাহাড়ের রং হলুদে বাদামিতে মেশানো। পাড়ে বালি। পাহাড়গুলোকেও দূর থেকে দেখে কেমন বালির বলে মনে হচ্ছে। প্রবল ঠান্ডা হাওয়া জবুথবু করে দিচ্ছে।

আরও এগোতে সো মোরিরি তার শরীর মেলতে শুরু করল। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে লেকের অন্য পাড় অনেক দূরে। পাড়ে বালির ফাঁকে ফাঁকে হলুদ হয়ে আসা ঘাস, ছলাৎ ছলাৎ করে পা ছুঁয়ে যাচ্ছে স্বচ্ছ সবজে-নীল জল, তার সাথে ভেসে এসেছে পাড়ের কিনারে জলজ গুল্ম। আর কিছু দিনের মধ্যেই তুষারের চাদরে ঢাকা পড়ে যাবে সব। বালি-পাহাড়ের হলুদের মাঝে নীল জল, ওপরে নীল-সাদা আকাশ, জলে ভাসা হাঁসের দল, আকাশে তাদেরই ক'জনের উড়ে যাওয়া... এ যেন অন্য এক পৃথিবীতে এসে পড়েছি। এই নিস্বর্গের ভেতরে একটা অপার শান্তি আছে।

ট্যুরিস্ট সিজনের শেষে সো মোরিরিতে পর্যটক শুধু আমরাই এখন। আসার পুরো রাস্তাটাতেই ক্বচিৎ কদাচিৎ দু-একটা মিলিটারি গাড়ি ছাড়া আর কোনও যানবাহন চোখে পড়েনি। বেশ কিছুক্ষণ পরে মালবাহী একটা ছোট ট্রাক এসে দাঁড়াল দূরে। ড্রাইভার আর খালাসি নেমে লেকের পাড়ে গিয়ে ফোন বের করে ছবি তুলতে শুরু করল। লেকের অন্যদিকে কোরজোক গ্রামে থাকা যায়। কিন্তু আবার আগের দিনের মতো বুইয়ের শ্বাসকষ্ট হলে রাতে সমস্যা হবে ভেবে আমরাই রাজি হলাম না। চুমাথাং-এ ফিরেই রাতে থাকা হবে ঠিক হল।

১৯/১০/২০১৫

সকাল সোয়া নটা, চুমাথাং

হটস্প্রিংয়ের পাশে ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে লিখছি। বেশ লাগছে একা একা এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে। ভোরের দিকটায় মেঘলা ছিল। এখন বেশ রোদ্দুর উঠেছে। হাওয়া দিচ্ছে। রাতে তো আরও জোরে বইছিল। হট স্প্রিং-এর ধোঁয়া ছড়াচ্ছে। তবে ব্রিজের নিচটায় জল খুব নোংরা। চারপাশেই হলুদ পাহাড়। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে অনেকটা জায়গা জুড়ে লালপাতার গাছের ঝোপ। সো মোরিরিতে গতকাল খুব কাছ থেকে দেখেছি, এগুলো আসলে কাঁটাগাছ।

কাল লামইং গেস্টহাউসে ছিলাম। কোরজোকের তুলনায় উচ্চতা কম এবং হটস্প্রিং থাকার দরুন চুমাথাং-এ শীতের প্রকোপ কম; তায় আবার এখানে ঘর গরমের এলাহি বন্দোবস্ত। গোটা দুয়েক রুম হিটার দেওয়াল জুড়ে। ঘরটা অতিরিক্ত গরম হয়ে বোধহয় অক্সিজেনে টান পড়েছিল। কাল রাত্তিরে আমারও অক্সিজেন লেগেছে কিনা, ওদের দুজনের সঙ্গে। বাপরে, কী হাঁসফাস লাগছিল... তারপর ওই রাত্তিরে দীপ জানলা খুলে দিলে তবে শান্তি হল।

পৌনে এগারোটা, সিন্ধুর তীরে

বেশ কিছুক্ষণ হল বেরিয়েছি। গাড়িতে বসে ঘুমাতে ঘুমাতেই ফিরছিলাম। খুব ক্লান্ত লাগছে আজ।

সো মোরিরি থেকে ফেরার সময় আরেকটা সুন্দর পাহাড়ি লেক সো কার দেখে লাদাখ অঞ্চলের আরেক গিরিপথ ট্যাংলাং লা (১৭৪৮০ ফু.) পেরিয়ে লেহ ফেরার কথা ভাবা ছিল। কিন্তু কোরজোক গ্রামে না থেকে ফিরতি পথে এগিয়ে এসে চুমাথাং-এ থাকায় আবার বেশ অনেকটা রাস্তা উল্টো পথে গিয়ে সো কারের রাস্তা ধরতে হবে। আমাদের সারথি তুন্ডুপের এলাকায় আজ ভোট। এই ক'দিন যখন যেখানে গাড়ি দাঁড় করাতে বলা হয়েছে থামিয়েছে, কিন্তু আজ আমাদের তাড়াতাড়ি লেহ পৌঁছে দিয়ে ভোট দিতে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে বেচারি। সরল সাধাসিধে লোকটার ভোট দিলে সমস্যার সমাধান হতে পারে এই আশায় আগ্রহী মুখটা দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল ওর সুবিধেমতই ফেরা হবে। অতএব সো কার অদেখাই রয়ে গেল।

তবু এ পথে আমার সবথেকে ভালো লেগেছে সিন্ধুকে। অনেকক্ষণ ধরেই সিন্ধুর পাশে চুপচাপ বসে থাকতে ইচ্ছে করছিল। অতএব পথের মাঝে ধসে ভেঙে পড়া রাস্তা সারাইয়ের জন্য যখন গাড়িটা আটকেই গেল অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য, ডায়েরি, পেন, মোবাইল ও যাবতীয় ধড়াচূড়াসহ ধপাস করে বসে পড়লাম পথের পাশে একটা চ্যাপটা পাথরের ওপর। সিন্ধু যদিও এখানে অনেকটা নিচে। আমি যে পাহাড়ের ওপর পথে বসে

আছি, ওপরে তাকালে মালুম হচ্ছে যে এ পাহাড়ে মাটির ভাগ বেশি। নিচে সিন্ধুর পাড়ের দিকে তাকালে আবার অজস্র বড় বড় বোল্ডার চোখে পড়ছে। অনেক পাথর আবার আটকেছে পাহাড়ের গায়ে মাঝপথেও। আসলে রাস্তা সারাইয়ের লোকজন ওপর থেকে পাথর ফেলছে। এখানে রাস্তা সারানোর পদ্ধতি এটাই। বেশির ভাগ পাহাড়ই ঝুরো পাথরের। জায়গায় জায়গায় সাইনবোর্ড-ও লাগানো - ঝুরো পাথর, ধস নামতে পারে, গাড়ি থামাবেন না। কোথাও ধস নেমে রাস্তা ভেঙে গেলে বি.আর.ও.-র লোকেরা সেখানে জমে যাওয়া বোল্ডারগুলো বুলডোজার দিয়ে ঠেলে পাশের খাদে ফেলে দেয় আর অন্যপাশের পাহাড়ের নিচের দিকটা আরও খানিক কেটে দেয়। এইজন্যই পাহাড়ে অনেক জায়গায় দেখা যায় যে রাস্তার ওপরে পাহাড়টা একটা ক্যানোপি তৈরি করেছে।

রোদ উঠেছে, তবে বড্ড ঠান্ডা। নীল আকাশে অনেক সাদা মেঘ ছড়ানো।

ডায়েরি থামিয়ে সিন্ধুর দিকে তাকিয়ে বসে থাকি এবার চুপ করে। এখানে ওর প্রবল তেজ নেই। উপচানো রূপ নেই। তবু এই শান্ত তিরতিরে নীল জল আমার ভালো লাগে। ওর সঙ্গে কল্পনায় চলে যাই ছেলেবেলার ইতিহাসের পাতায়। নদীর ওপাড়ে চোখ যায়। পশমিনা ছাগলের একটা বড় দল নিয়ে চরাতে যাচ্ছে একজন। সেই প্রাচীন সিল্ক রুটের সময় থেকেই এই পশমিনা উলের কদর সারা দুনিয়ায় - মনে একটা প্রশ্ন জাগে হঠাৎ, পশমিনা থেকেই কি পশম শব্দটার উৎপত্তি?

বেলা একটা, হেমিস গুম্ফা

কারু আর উপসির মাঝে বড় একটা জায়গা জুড়ে হেমিস গুম্ফা। লেহ থেকে দূরত্ব ৪৫ কিলোমিটার। প্রচুর গল্পকথা আছে এই প্রাচীন মনাস্ট্রিকে ঘিরে। এগার শতকের আগেও এই মনাস্ট্রির অস্তিত্ব ছিল। তান্ত্রিক যোগী তিলোপার শিষ্য নারোপার কাহিনিতে এই মনাস্ট্রির কথা পাওয়া যায়। নারোপার জীবনীগ্রন্থটি এই মনাস্ট্রিতে রাখা আছে। তাতে নারোপাকে বিহারের নালন্দা বৌদ্ধবিহারের প্রধান গুরু রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত তুর্কি ও আফগান আক্রমণের সময় নারোপা সেখান থেকে হেমিসে চলে আসেন। হেমিসে এসে নারোপা তান্ত্রিক গুরু ঘন নীল রঙের চেহারার তিলোপার সঙ্গে দেখা করলে তিনি তাঁকে বারোটি বড় কাজ ও বারোটি ছোট কাজ দেন যা নারোপাকে সবকিছুর ভেতরের অন্তর্লীন শূন্যতা এবং মায়াকে চিনিয়ে আলোকপ্রাপ্ত করবে। এবং তাঁরা দুজনেই সেইসময়ের মগধের একটি মনাস্ট্রি ওতন্ত্রতে (বর্তমান ওদন্তপুরী) যান। নারোপাকে বৌদ্ধ ধর্মের কাগয়ু-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। হেমিসও তাই এই সম্প্রদায়ের একটি মূল গোম্ফা।

হেমিস মনাস্ট্রিকে নিয়ে আরও একটি চমকপ্রদ কাহিনি আছে। ১৮৯৪ সালে রাশিয়ান সাংবাদিক নিকোলাস নোতোভিচ হেমিস ভ্রমণ করে এই তথ্য তুলে আনেন। যিশু খ্রিস্টের অজানা কাহিনি 'দ্য লাইফ অফ সেন্ট ইসা, বেস্ট অফ দ্য সনস অফ মেন'-এর উৎস তাঁর ভারতবর্ষে গোপনে থাকার সময়ে এই হেমিস মনাস্ট্রিই। নোতোভিচ বলেন যে, সেই পুঁথি এই মনাস্ট্রিতে রক্ষিত আছে, তা নিজের চোখে দেখেছেনও। হেমিস ভ্রমণের কথা লিখতে গিয়ে পরবর্তীকালে স্বামী অভেদানন্দও তাই লিখেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে অনুসন্ধান করে এই দুই কাহিনিরই কোনও সত্যতা প্রমাণিত হয়নি। যদিও প্রাচীন রেশমপথ ধরে তুর্কি, পারস্য হয়ে যিশু ও মেরির কাশ্মীরে আসা ও বসবাস নিয়ে বছর কয়েক আগে হোলগার কার্স্টেনের বেস্টসেলার গ্রন্থ 'জেসাস লিভড ইন ইন্ডিয়া'-ও বেশ বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল। তবে সত্যি আমারও খুব মনে হয় যে, পুরোনো মনাস্ট্রিগুলোর আলো-আঁধারিতে আলমারির কাচের আড়ালে থরে থরে রাখা প্রাচীন পুঁথিগুলোর ভেতরে কত যে কাহিনি আর রোমাঞ্চ লুকিয়ে আছে তা কে জানে!

গুরু পদ্মনাভ-র জন্মদিবস উপলক্ষে হওয়া দুদিনব্যপী হেমিস উৎসব দেখার মত। জুন মাসের শেষের দিকে এই উৎসবের সময়। সবচেয়ে বড় আকর্ষণ লামাদের মুখোশ নৃত্য।

বেশ অনেকটা হেঁটে পাহাড় বেয়ে উঠে দেখি দুপুর হয়ে যাওয়ায় হেমিস গুম্ফা বন্ধ। স্থানীয় মেয়েদের একটা দল গল্প করতে করতে নিচে নামছে। এতদূর এসে এমন বিখ্যাত একটা মনাস্ট্রি না দেখেই চলে যাব? অতএব অপেক্ষা। বিশাল চাতালে শুধু আমরা ক'জন। মনাস্ট্রির বাসিন্দাদের কাউকেও দেখা যাচ্ছে না। অনেকক্ষণ পর যখন প্রায় হাল ছেড়ে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবছি, অবশেষে দরজা খুলল। ওপরতলায় গুরু পদ্মসম্ভবের বিশাল একটি মূর্তি। হাতে মেডিসিন বুদ্ধগুলির মতোই ওষুধের পাত্র। পায়ে জুতো। মূল মন্দিরে বুদ্ধমূর্তিটি বেশ অদ্ভুত। মাথায় তিব্বতি স্টাইলে টুপি। চেহারাও অন্যরকম। হাতে পদ্মফুল। তলায় কাচের পাত্রে সম্ভবত ওষুধ। বাঁ হাতে কালো রঙের একটি অদ্ভুত ধরণের মূর্তি। গুম্ফার ছাদে গিয়েছিলাম।

ওখানে একটা কালীমন্দির আছে। বন্ধ ছিল। রুক্ষ পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে অনেকটা জায়গা জুড়ে ইতিউতি ছড়িয়ে আছে মনাস্ট্রির ঘরবাড়িগুলো। সামনে পাথুরে পাহাড়ের সারি স্তরে স্তরে - নিচে অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে কারু। ওপর থেকে চারপাশটা দেখতে ভারী ভালো লাগছিল। কিন্তু বড্ড ক্লান্তও।
বিকেল এগিয়ে আসছে। তুন্ড্রুপ তাড়া দিচ্ছে এবার - ফিরতে আরও দেরি হলে ভোট দেওয়া হবে না ওর! আবার সেই চেনা পথে লেহ ফিরে এলাম।

.....

মিলিটারি এলাকা পেরিয়ে আসি। তবু তারপরেও যেন
মনে হয়, অন্য এক পৃথিবীতে বেঁচে আছি, অন্য কোথাও -
যেখানে হানাহানি নেই, অযথা হত্যার দরকারও নেই কোনও।
রাজনীতির অঙ্ক বা ধর্মের চালও নিষ্প্রয়োজন।
নীল জলে সাদা পাখির দল, ওই দেখো, আকাশে হাত বাড়ায়।
সাদা মেঘ নিয়ে খুব নিচু হতে হতে আকাশও নেমে আসে হলুদ বালি পাহাড়ের কাছে।
এই পৃথিবীতেই দূরে, খুব নির্জনে একা একা বেঁচে থাকে এক হ্রদ - নীলবসনা
সো মোরিরি।

(ক্রমশ)

আগের পর্ব - তৃতীয় পত্র

~ *লাদাখের আরও ছবি* ~

লেখালেখি, বেড়ানো, নানা রকম বই পড়া, ন্যাশনাল লাইব্রেরি আর কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়ায় যাওয়া, কখনোবা গলা ছেড়ে গান গাওয়া এইসবই ভালো লাগে 'আমাদের ছুটি'-র সম্পাদক দময়ন্তী দাশগুপ্তের।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

স্মৃতি বুনে এলাম

অধীর বিশ্বাস

স্মৃতি বুনে এলাম, না, নিয়ে এলাম? উত্তর দিতে পারে ঢাকার বুড়িগঙ্গা। অঙ্কুরের মেসবাহউদ্দিন রোজ হাঁটতে যায় কূল ধরে। পলকে পলকে জাহাজ। আমরা হাঁটতে থাকি। কত কথা উঠে আসে। নদীকে সঙ্গী করলে মনটা পাপহীন হয়ে ওঠে নাকি!
তাঁর বাড়ি বুড়ি থেকে হাঁটাপথ। দোতলার মেঝে দখল করে ছিলাম বেশ কদিন। যাবার বেলা সময় হল শিল্পী ধ্রুব এষের। মনে হল বাসিপেটে ছফুটের দেহ নিয়ে চলে এল আমাদের দেখতে। ডাক দিল, দাদা!
জড়িয়ে নিলাম। বউদির হাতে তুলে দিল বাংলাদেশের সব নদীনামের চাদর। দাদার জন্য রবীন্দ্রলেখা বস্ত্র। ভাবছিলাম, স্মৃতি কি শুধু যাপন? ঘরসংসার? বেদনা? তুলে দেওয়া কিছু নয়?
দেশ তবু পিছু ছাড়ে না। 'গাঙচিল'-এর প্রকাশক অণিমা সঙ্গ নিল। অথবা সঙ্গী করল আমাকে। অনেকে বলে ওর হেডকর্মচারী আমি। খাওয়াপরা আর হাতখরচা তার ওপর নির্ভর করে। অণিমা কলকাতা ফিরছে ছেলেদের কাছে। স্বভাবতই নিমগ্ন সে।
একটু পরেই ঢাকা-কলকাতা রেলগাড়িটি ছেড়ে দেবে। পাহারাদারও কি আনমনে, অণিমার মতো?
বাড়িতে এসে কেবলই নানামুখ উঁকি দিয়ে যায়। বুড়িগঙ্গার পাশ দিয়ে দেহটা ধরে নিয়ে যাচ্ছে কেউ। কে সে?

. . . .

এই আমাদের বাংলা, এভাবেই তো বেঁচে উঠেছি! ভুলে ছিলাম। হয়তো ভুলতেও চাই। নাগরিক হয়ে উঠলে কে মনে রাখে? কিন্তু কখনওসখনও পড়ে হঠাৎ-ই। গতকাল ঢাকার ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে থমকে দিল ছেলেবেলা। দেখলাম শৈশবকে। আঁচল-আশ্রয় মা আমাদের উঠোন ছেড়ে দেবার পর কপাল পুড়ল চিরতরে। তার পর বাবা দাদা কেন মারত? কচার বাড়ির দাগড়া দাগ নিয়ে হাটের চালার নীচে ঘুমিয়ে থাকতাম। সূর্য ডুবলে দেখি আমার মতো আরও কেউ জায়গা খুঁজছে। তার পর কাছাকাছি। জড়িয়েমড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়া। পাশে-ঘুমনো জগা-পাগলের হো হো হেসে ওঠা কিংবা জোরশব্দের কথাবলায় ঘুম ভাঙত। না, বাড়ি যাব না কোনও দিন! মা থাকলে শত-অবাধ্যেও মারত না কেউ। আবার হাঁটা। কোনও গ্রামে গিয়ে সুপুরিপাড়া, আগাছা-জঙ্গল সাফ করার পর খাওয়া। আচ্ছা, বাবা দাদা খাওয়ার সময় আমার কথা বলে না? - এমন সব মায়াচিন্তায় নিরুদ্দেশ-থাকা ছিল। মাগুরার সাতদোয়া শ্মশানে চলে যেতাম। সন্ধেনামা মুহূর্তে শকুন কেঁদে উঠত। আমাকে দেখে? ওই একাকীলগ্নেও ভয় করত না। যতক্ষণ চোখ থাকে, সেই দৃষ্টিতে আমার চোখ থেকে মাকে শুইয়ে-আনা বালিশটাকে কিছুতেই সরতে দিতাম না। খাগড়াজঙ্গলের ওই বালিশ আবার ফিরে এলো। ঢাকার রাস্তায় অঘোর-ঘুমনো বালকদের একজনের মুখ বদল করলে তো আমিই!

অন্য ছবিটায় তীব্র হয়ে দেখা দিল বাবা। আমার বাবাও এমন আয়োজনে চুলদাড়ি কাটার অপেক্ষায় বসে থাকত ক্ষুরকাঁচির সংসার বিছিয়ে। হাটের দিন অনতিদূরেই আমি। 'ও চাচা, আসো! বাবা ভাল করে চুলটা কেটে দেবে!'

ঢাকা

পঁয়ত্রিশ বছরের রক্তের টান। সকালে উঠে প্রথম খোঁজ খবরের কাগজ। বেলা বাড়তেই নিশানা বইপাড়ার দিকে। প্যারীদাস রোডের সাইনবোর্ড: মুক্তধারা আর পুঁথিপত্র। বাংলাবাজার গলিপথ পেরিয়েই। নওরোজ সাহিত্যসম্ভার। মাওলা ব্রাদার্স। বাঁক পেরিয়ে বইবাড়ি। প্রচুর সৃজনশীল প্রকাশনা। অংকুর ও চারদিক প্রকাশনার ঘরে আড্ডা হল। প্রকাশকদের সঙ্গে হাই-হ্যালো করে একটু এগোতেই পোস্ট অফিসের গলিতে কলেজ স্ট্রিটের শ্যামাচরণ দে কিংবা বঙ্কিম চ্যাটুজ্জে স্ট্রিট ভেসে আসছিল। এখানেও প্রচুর কাটাকাটির দোকান ভর্তি।
'গাঙচিল' নাকি স্বপ্নের উড়ান দিয়েছে। ঢাকার শাহবাগ এলাকায় জাদুঘরের পাশে 'পাঠক সমাবেশ।' ঢুকে কিছুক্ষণ শব্দহীন দাঁড়িয়ে থাকা। কলকাতায় অক্সফোর্ড বুকস্টোরে ঢুকে মনে হয়েছিল বইজগতে এসে জীবন সার্থক। সেই ধারণা বদলে গেল। মনে হচ্ছিল ফরাসিদেশে বাংলার কোনও ব্যবসায়ী বইয়ের বিপণি খুলেছেন। পাঠক সমাবেশের কর্ণধার বিজুভাই সেই স্বপ্নেরই সওদাগর বুঝি।

সৌভাগ্য ছাড়া কী বলব নিজেকে? আমার ছবি টাঙিয়ে 'boinews24.com'-অন্যতম রবিন আহসান বন্ধুত্বের ফাঁকে আয়োজন করে ফেললেন 'বইআড্ডা'র। পাঠক সমাবেশের ওই ফেস্টুনের ছবি নিজেই তুললাম। সঞ্চালনা করলেন রবিন। অনেক কিছু বলতে দিলেন ওনারা। আমার কথা

ধরে বললেন কেউ কেউ। প্রকাশক অধ্যাপক। বই-প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তাও। 'প্রকৃতি'র হাবিব এড়েবেড়ে ধরল। অনেক প্রশ্ন তাঁর। উত্তরও দিলাম রক্ষণাত্মক। সংস্থার কর্ণধার বিজু চা-পানি দিলেন। আপ্যায়নও আন্তরিক। মুগ্ধময় পরিবেশে পাঠক সমাবেশ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ সঞ্চালক রবিন আহসানকেও। কৃতজ্ঞ রইলাম শহরবাসীর কাছে। ছবি টাঙানো আমাকে বেশ লাগছিল কিন্তু। মনে মনে বললাম, ছেলেদের বলে যাব, কিছুকালের মধ্যেই যদি চলে যাই, তোদের ঘরে এই ছবিটাই টাঙিয়ে রাখিস! দেশমাটিতে পা রেখে কেন মনে হল কথাটা!

চট্টগ্রাম

বাতিঘরের দীপঙ্কর বলল, পাহাড়তলি এলে বলবেন। রেলের কামরা লাইন, ভারতের মত নয়। কলাপাতা শাড়ি জড়িয়ে তন্বী-চেহারার বাংলাদেশ রেল নিয়ে এল আমাদের। ছিমছাম আধুনিক শহর। ঢাকা থেকে যাত্রাকালে জনৈক প্রকাশক জানিয়ে দিলেন, চট্টগ্রাম ইন্টেলেকচুয়ালদের শহর। শ্বাসপ্রশ্বাসে টের পাই তা। এ-ও টের পেতে থাকি, কোনও দিন, বিশাল এক পাখি এসে শহরটাকে তুলে পাহাড়ের শরীরে নামিয়ে বাস করার অনুমতি দিয়ে গেছে।

পাশেই কর্ণফুলি। নদী না কি সাগরের ডালপালা? কত অজস্র কনিষ্ঠ-জাহাজ! দক্ষিণে মাস্তুল আর মাস্তুলের ঝাপসা-আদল। এ বার বুঝলাম, ছোটবেলায় পড়া 'চট্টগ্রাম কীসের জন্য বিখ্যাত?'
একটু বাদেই রওনা হব পতেঙ্গায়। ওখানে আর কী দেখব, জানি না। বইয়ের জন্য এত বড় বাড়ি বানিয়ে ফেলল 'বাতিঘর'-এর দীপঙ্কর? বইব্যবসা নিয়ে আর কী মনে আছে, অবাক হয়ে ভাবছি! জাহাজ-আদলের এই বইবাড়ি চট্টগ্রামকে দর্শনীয় করে তুলেছে। ঢাকার পাঠক সমাবেশ, দীপঙ্করের এই বাতিঘর আমাদের মতো নগণ্য প্রকাশনায় যুক্ত মানুষদের বলভরসা।

পাঠক সমাবেশের আড্ডায়

বাল্যকালে জানতাম, চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের জন্য বিখ্যাত। আবার পড়েছি, কক্সবাজার কোথায় এবং কীসের জন্য খ্যাত। সেই স্বপ্নের দেশ চাটগাঁয়ে দেখলাম টিলার ওপর শহরের আশপাশে অন্তত বেশ কয়েকটি দর্শনীয় স্থান আছে। কক্সবাজার তো বটেই, আছে পতেঙ্গা বন্দর কর্ণফুলির মোহনা। স্থানীয় নামজাদা লেখক বলছিলেন, নদীর ওপারে এমন মহল্লা অবস্থান করছে সেই ঔপনিবেশিক আমল থেকে, ঢুকলে মনে হবে যেন নিউজিল্যাণ্ডে এসে পড়লাম।

সময় কম ছিল। কক্সবাজারে যাইনি। গেলে রোহিঙ্গা শরণার্থী দেখতে সাধ জাগত। এই বন্দরপরিবেশ সৌন্দর্যে পৃথিবীর যে কোনও সৈকতের চেয়ে আকর্ষক। অতএব থেকে যাওয়ার বায়নাদমন, মনুষ্যজীবনে বেদনার।
আর? আছে। তা হচ্ছে ফয়েস লেক। তারই প্রতিবেশে চিড়িয়াখানা অবস্থিত। সেই লেকেরই দৃশ্য। যেন কিছুদিন আগে বেড়ানো পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের খাঁড়ি দিয়ে যাত্রা চলেছে যেন। যেন অপর দিক থেকে আমাদেরই মতো কোনও ভ্রমণার্থীদল ফিরছেন।
অন্যটি জাহাজবাড়িতে বইবিপণি। বাতিঘর। ঘরের গড়নটি বন্দর-অতিথি জাহাজকে মনে রেখে। সত্যি বলতে অভিনব তার রূপকল্পনা, যা বাংলাদেশ কিছুটা গর্ব করতে পারে। সাবাশ! - ফয়েস লেক কর্ণফুলির বাচ্চা বাচ্চা অসংখ্য জাহাজের মাস্তুল আর ঘোলাজলের উদ্দামতা চোখ থেকে মুছে যাওয়ার নয়, দেখছি!

কর্ণফুলির ভোটিতে

জাহাজের মাস্তুল, না, কী ওটা, লেখার সময় কাকে জিজ্ঞেস করব? মাস্তুলের পেটে কোলে ভর্তিবই। ধন্যবাদ বাতিঘর, এই প্রান্তজনকে নিয়ে কিছু বলাবলির অনুষ্ঠান করার জন্য।
বাংলাদেশে দীপঙ্করের পরিচয় 'বাতিঘরের দীপঙ্কর'। চট্টগ্রামে বাতি জ্বেলেছে জাহাজবাড়ির ন্যায় স্বপ্নের বইঘরে। কত যে পাঠক! বইকারবারি আমাদের চোখ জুড়িয়ে গেল। এই যুবক এবার মেতেছে ঢাকার 'বিশ্বসাহিত্যকেন্দ্রে' কয়েক হাজার স্কোয়ার ফুটের বইকেন্দ্রের। রূপায়ণ শেষের পথে। আমরা আশাবাদী।

স্থানীয়জনরা বলেন চিটাগাঙ। আমরা চট্টগ্রাম। নিজেদের মধ্যে কথা শুরু করলে শুধু তাকিয়ে থাকা ছাড়া কোনও উপায় নেই। চিটাগাঙে কুমিল্লা নোয়াখালির কথ্যভাষার ছন্দ চলে। না-বুঝলেও অনুভব করা যায়। মায়ের ভাষা আমার মুখ দিয়েও বেরিয়ে পড়ে আনমনে। পতেঙ্গার সমুদ্রসৈকতে যাবার বাসে এমন কথোপকথনের ছন্দ উপভোগ করছিলাম। সত্যি, বাংলায় কত শব্দভাণ্ডার! কত কত লোকভাষা!

দীঘার সমুদ্রে ঢেউ আর গর্জন। পতেঙ্গা শান্ত। বড় হলে শান্ত হয়? বড়, না, গভীর? কর্ণফুলি থেকে এখানে যাকে বলে প্রকৃত জাহাজ! সে জাহাজ দূর-চোখে দেখছিলাম বহু দূরে নোঙরকরা। তার আশপাশ ছোটগুলো পাহারায় যেন। গোনা যায় না। খিদিরপুরে যা দেখেছি, এর চেয়ে অতিকম। তার জন্যই কি বড় করে লেখা: সমৃদ্ধির স্বর্ণদ্বার?
বাংলাদেশের এই প্রাকৃতিক সম্পদ সত্যিই গর্বের। যারা প্রাণভরে ওই প্রকৃতি গ্রহণ করে যাচ্ছি, তা টাকাপয়সা বা সোনা দিয়ে নয়, সে-মূল্য কী, মাপ করতে সময় লাগবে!
পুনশ্চ - এখানে গাড়ির নম্বর লেখার নিয়ম: চট্ট মেট্রো গ ২০১৭

বাতিঘর - চট্টগ্রাম

ঢাকায় আবার

মেসবাহ বলে

পতেঙ্গা

দিয়েছিলেন কনকর্ড মার্কেটে যাওয়ার পথে দীপনপুর ঘুরে আসবেন। দীপনপুর? সে গ্রাম কোথায়? না। এটাও বইবাড়ি। পরিচালক চিকিৎসক। স্বামীর স্মৃতিকে সম্মান জানিয়ে এই বিপণি চালান। কথা হল একটুক্ষণ। এঁদের সঙ্গে ব্যবসার আগ্রহ রেখে বিদায় নিলাম।
কনকর্ড-এও অনেক বিপণি। প্রকাশনা। সাজানোগোছানো। 'প্রকৃতি'ও এখানে। হাবিবের আতিথ্যে ইলিশ-খিচুড়ি শুধু মুখে নয়, অন্তরজুড়ে রেখে দিলাম। ঢাকা তো রাষ্ট্র একটা। প.ব. থেকে একটু বড়, কিন্তু আতিথ্য আর ব্যবহারে আমাদের থেকে বড়ই বড় মনে হল। ঢাকা আর চট্টগ্রামকে একযোগে জানাই বিজয়ার শুভেচ্ছা।

ঢাকার বাংলাবাজারে বাখরখনি তৈরিতে ব্যস্ত কারিগররা

মুক্তিযুদ্ধের সময় এসেছিলাম। বয়সে আমি পূর্ণকিশোর। পরের বছরই বস্তিজীবন ছেড়ে যাব। কলকাতা পুরোপুরি নকশাল। রেডিওতে স্বাধীন বাংলাদেশ বেতারকেন্দ্র - আমার সোনার বাংলা/আমি তোমায় ভালবাসি। রাস্তাঘাটে নতুন মুখ। দালানবাড়ি দেখতে দেখতে মানুষ হাঁটছে। জিজ্ঞেস করলে, 'জয় বাংলা।' তখনকার সামরিক শাসনের বিপক্ষে তৈরি হয়েছিল সিনেমাটা। ছবিতে এই গানটাও ছিল। চাবির গোছা মহিলার আঁচলে। একাই শাসন করেন। তার নির্দেশেই চলে গোটা দেশ। বহু সংগ্রামের পর দেশ স্বাধীন হল। কিন্তু ছিটিয়ে পাকসেনাদের রাজাকার। ওদের হাতেই ঢাকায় খুন হন চলচ্চিত্রকার জহির রায়হান। ঢাকায় আমার অতিথিনিবাস মেসবাউদ্দিনের বাড়ি। তার থেকে অল্প দূরেই পরিচালকের নামে এই প্রেক্ষাগৃহ। বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে ইচ্ছে হচ্ছিল গানটা আবার গাই: আমার সোনার বাংলা/ আমি তোমায় ভালবাসি...
ঢাকার কলেজস্ট্রিট 'বাংলাবাজার'-এর ছবি ধরতে ভুলে গেছি বলে দিতে পারলাম না। ওখানকার প্রকাশক নওরোজ সাহিত্যসম্ভারের জর্জভাই বললেন, এ অঞ্চলে প্রায় দু-হাজার প্রকাশক। সত্যি, অবাক হওয়ার মতো। পাঠ্যবই ইসলামি-প্রকাশনা বেশি অবশ্য। এখানেও কাটাকাটি-প্রকাশক। সাহিত্য-প্রকাশনায় যে সব বই দেখলাম, রীতিমতো ঈর্ষনীয়। বিভিন্ন বই দেখে মনে হচ্ছিল, বইটা যদি আমি পেতাম!
অভিজাত এলাকা শাহবাগ। ধানমণ্ডি। গুলশন। পুরনো পল্টন। আরও। সব তো জানি না এখনও! 'তক্ষশিলা' জানতাম। বই নেন। কিন্তু পরিচালক দিদিকে দেখেই মনে হল, শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত। পরিচয়ে জানলাম, যশোরের কন্যা। রাজনীতিতে ছিলেন দীর্ঘদিন। তার আগেই সাহিত্যে অনুরাগ। চাকরি করেছেন। পোষাল না। ঠিক করলেন বইব্যবসা করবেন। করলেনও। এই জীবিকায় বয়স তাঁর সাতাশ বছর। পরিচ্ছন্ন এই ব্যক্তিত্বের সঙ্গে বারদুয়েক দেখা হল। কথা হল অনেক। আশাকথা।

ঢাকার 'বিউটি বোর্ডিং'-এর কলকাতার কফিহাউসের মতো সম্মান। ইতিহাসের সাক্ষ্য নিয়ে অবস্থান করছে বাড়িটা। লেখক চিত্রশিল্পী রাজনীতিবিদ, কে আসেননি? জর্জভাই মেসবাহউদ্দিন আর বাংলাবাজারের সফরসঙ্গী জাহাঙ্গীর লোডশেডিং-এর মধ্যে মোবাইলে আলো জ্বালিয়ে দেখাচ্ছিলেন। খাওয়ার জায়গা, ঘরগুলো। দেওয়ালে সম্ভবত প্রখ্যাত মানুষদের নাম লেখা ছিল। ছোট্ট বাগানের কোণে কবি শামসুর রাহমানের স্মৃতিফলক দেখে বেরিয়ে এলাম।
গল্প করছিলেন সেই সব ব্যক্তি, যাঁদের পদধূলির চিহ্ন রেখে দিয়েছে বাড়িটা। বিউটি বোর্ডিং। কত নাম। বিখ্যাতজনদের সব নাম জানিও না। মুজিবর রহমান শুধু মনে আছে। ওনারা বলছিলেন, ঢাকার বইমার্কেট 'বাংলাবাজার' ঘুরবেন অথচ এই স্মৃতিবিজড়িত বোর্ডিং না-দেখে গেলে হৃদয় অপূর্ণ রয়ে যাবে।

পাখির দৃষ্টিতে ঢাকা শহর

শোনা গেল, পুরোপুরি সরকার নয়, তার নজরদারি আছে বাড়িটি ঘিরে। যেমনটি আমাদের কলকাতার কফিহাউস। তর্ক নীলনকশা প্রণয় রাজনীতি - এক কথায় ইন্টেলেকচুয়ালদের নিজস্ব-অঙ্গন। আমাদের পরিক্রমা অনেকটা অমন মানসিকতায়।

শহীদস্মারক স্তম্ভের সামনে স্ত্রী অণিমা বিশ্বাসের সঙ্গে লেখক

ঢাকার ভিক্টোরিয়া পার্ক ঘুরে ঘুরে চলার মধ্যে দেখি অদূরে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। গোলাকৃতি নামটি দেখেই মনে পড়ে জগন্নাথ হলের কথা। এর মধ্যেই কি সেই বহু হত্যালীলা সংঘটিত করে পাক ও রাজাকারবাহিনী। আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম এমনই কোনও বীর সংগ্রামীদের স্মারকপীঠে। সহচর ইসমাইলকে অনুরোধ জানাই ছবি তোলার জন্য। শহীদস্মারক স্তম্ভকে স্বাক্ষী রেখে আমাদের স্মৃতি রেখে দেওয়ার সেই সময় বেলা দ্বিপ্রহর।

শহর পরিক্রমা ফের শুরু। অচেনা দেখে নাগরিকরা বুঝতে পারে, বিদেশী আমরা। এ ভাবেই শহর ঘুরি। অটো ও দেশে সিএনজি নামে পরিচিত। কখনও বাসেও যাতায়াত। কিন্তু আধঘণ্টার পথ লাগে দেড় ঘণ্টা। এত জ্যাম। অন্তত এমন অভিজ্ঞতা। অন্যদের হয়তো অন্য। তবু ঢাকা বা চট্টগ্রামের মায়া ছাড়ছে না। থেকে থেকেই মনে পড়ছে। মন পড়ে থাকার মায়া হয়তো এ ভাবেই গড়ে ওঠে, রয়ে যায় চিহ্ন হয়ে!

ঢাকা শহরে দিকবিদিক তাকালে খালি ব্যাঙ্ক আর রেস্টুরেন্ট। কোথাও ঘিঞ্জি, কোথাও কলকাতাকে লজ্জায় ফেলে দেবে। মানুষ না-দেখে দেখি যদি, উন্নত কোনও মেট্রোসিটির আদল। দোতলা বাস দেখে, ঘোড়ার গাড়ির টকটক, রাজাবাজার কিংবা খিদিরপুরের রাজপথ সঙ্গে এসেছে বুঝি। এই বাস দেখে খানিক অচেতনে চলছিলাম। শিয়ালদার ক্যাম্বেল হাসপাতালের (নীলরতন সরকার হাসপাতাল) সামনে থেকে ডাক্তার দেখিয়ে দোতলা বাসের বায়না করতাম। রোগেভোগা আমার কথায় বাবা রাজি হত। দোতলা বাস হাওড়ার ব্রিজ আকাশবাণী শৈশবের স্বপ্ন। এ-বাস কলকাতায় নেই আর। সেই বাসে নামার সময় একদিন কন্ডাক্টর ভাড়া চাইলেন। বাবা বলল, হয়ে গেছে!

বাবা টিকিট কাটেনি। দশ পয়সাও যদি বাঁচানো যায়! হাসপাতালের বিনা পয়সার চিকিৎসা, বাসভাড়া বাঁচানো, বস্তিবাড়ির দশ টাকা ভাড়া দিয়ে সে জীবনে কি খারাপ ছিলাম?

এর পর ঢাকা ছেড়ে ফিরব পুরনো বাসায়। টের পাচ্ছি, আমার অতিথি-অঞ্চল গেণ্ডারিয়ার মিলব্যারাক, মেসবাহর ১৯০৫ সালে তৈরি বাড়ির দোতলার মেঝের শীতলতা আমাদের পরম আদর দিয়েছিল। ভোরের আজান মাদ্রাসায় পড়া শিশুরা জানলই না কলকাতা থেকে অতিথি এসেছিল দুজন। কিন্তু যে-ভোরে যাত্রাসময় তখন ওরা ব্যস্ত থাকবে উচ্চকণ্ঠে পড়াশুনোয়। তবু যে যাব আমরা!

জল এখন নিশিন্তভূমি। ডিম ছাড়বে ওরা। বিরক্ত করা যাবে না। ধরা যাবে না। তিন মাস ওদের থেকে দূরে থাকতে হবে। ইচ্ছে হলেও ওদের পাব না। বাংলাদেশ সরকার বছরে দুবার এমন নিষেধাজ্ঞা জারি রেখেছে। এপ্রিল আর অক্টোবর। এপ্রিলে নিষেধ ছিল বলে ঢাকার রাস্তাঘাট ভরে উঠেছিল রুপোলি ইলিশে। শোনা গেল, বইমার্কেট বাংলাবাজারের পাশে ঝাঁকার মধ্যেও হাজির ছিল রূপসম্পদ ইলিশের ঝাঁক। আমরা মেসবার বাড়িতে ঝোল ভাজা সর্ষেবাটা দিয়ে রোজই প্রায়...

শুধু হুকুম নয়, ধীবরবৃন্দ চালগম কিছু নগদও পান ওই সময়। মাছ ধরতে না-পারলেও অন্য কর্মে বাধা নেই। দেখলাম, ঢাকার মাছবাজারে পুলিশ মোতায়েন। ১ অক্টোবর থেকে দেড় মাস ইলিশ বিক্রিও বন্ধ। কেমন না? আমাদের দেশেও এই নিষেধাজ্ঞা বলবত। মানা হয় কই? ঢেলে বিকোচ্ছে খোকা-ইলিশ। পুলিশ? দেখি না তো! থাকতে পারে, চোখ যায়নি।

ফেরা

আমার ঘড়ির সময় সকাল ৮-২৫. ঢাকা-কলকাতা মৈত্রী-এক্সপ্রেস যাত্রা করল। যমুনা সেতু পার হতে প্রায় দশ মিনিট। নদীমধ্যে কিছু দেখা। চর। কিংবা পাড়। পেরিয়েই দেখলাম ফলক। বঙ্গবন্ধু সেতু।

এখন ছেড়ে-আসা প্রিয়জনদের ফোন পাচ্ছি। মনখারাপ। পার হয়ে যাচ্ছে ঈশ্বরদী জংশন। ফলকটাও আড়াল হল এইমাত্র। তবু, ফিরতে তো হবেই!

কিন্তু যা স্মরণীয় হয়ে থাকবে, যে যে ঘটনা বিদ্ধ হয়ে থাকবে, তার মধ্যে বাংলাদেশের প্রথমশ্রেণীর দৈনিকের সম্পাদক মতিউর রহমানের সঙ্গে সৌজন্যসাক্ষাত। তিনি আমাদের যৌথজীবনের মধ্যমণি হয়ে ছবি তুললেন।

দৈনিক প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমানের সঙ্গে গাঙচিল প্রকাশনীর অনিমা বিশ্বাস ও লেখক

সহকর্মীদের পরামর্শ দিলেন, অধীরবাবুকে পেয়েছ যখন, প্রকাশনার খুঁটিনাটি জেনে নাও। প্রথমার দায়িত্বভার জাফরভাইয়ের হাতে। যুবক সম্পাদক। তাঁর সঙ্গে নিবিড় হয়ে রইলাম দুদিন। দুদিন পর লিখিত প্রশ্নপত্র। এক এক করে আমার দর্শন এবং আমি যা বুঝি, সেই মতো উত্তর দিলাম। অণিমাও বলছিল নিজের মতোই। পরে মধ্যাহ্নভোজ। যেন ফাইভস্টার ব্যবস্থা। অবশ্য মতিভাইয়ের নির্দেশ ছিল, অধীরবাবুর কাছ থেকে না-জেনে খেতে দেবে না! মজার মানুষ হিসেবেও দেখলাম তাঁকে।

কর্মজীবনে পঁয়ত্রিশ বছর ছিলাম এমনই এক সংস্থায়। অবশ্য নিম্নপদ। ওই পদেই অবসর। সম্মান পেলাম 'প্রথম আলো'য়। আমার প্রতিষ্ঠানের কথা মনে পড়ছিল। আবার মনেও হল, দীক্ষা তো পূর্বতন আশ্রমেই!

'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি।' ভুল হলে বন্ধু, ক্ষমা করবেন। শুধু ঢাকা আর চট্টগ্রামে দেখা দৃশ্য। গোটা বাংলাদেশ পরিক্রমার আর কিছু যদি কপালে জুটত! জীবনে পূর্ণতা দিতে নেই। তা হলে টান থাকে। টান মানে দেহ যদি কলকাতা, ধড় তবে বাংলাদেশ। আমার শৈশবভূমি। এ-ভূমি দেহে কেন এমন ভাবে পলি ফেলে গেল? ভাগ্যিস মায়ের সংসারক্ষেত্রে যাইনি! যে গ্রাম তার নিয়তি ছিল, যে গ্রামের উঠোনে আঁচলধরা চলাচল ছিল আমার, ওই গ্রামে গেলাম না। গেলে দেখাচোখ যদি সহ্য করতে না-পারে?

এগারো দিন তাই কাটল বুড়িগঙ্গা তীরলাগোয়া গেণ্ডারিয়া মিলব্যারাকে। সন্ধেয় বেড়াতে আসা। দুপুরে পাড় ধরে নতুন ঢাকা যাওয়া। ধীরে ধীরে চেনা হয়ে যাচ্ছে। বুড়িগঙ্গায় চোখ-আঁকা জাহাজের সারি পূর্ণ বিশ্রামে। মনে পড়ল, রাজাপুরের ওই চোখচিত্রণ লঞ্চই তো নিতে আসত আমাদের! এখানেও কি নিতে আসছে মা ও ছেলেকে?

আমার নীরব মনেপড়াগুলো ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। সকলকে বলে এসেছি, আবার আসব! কিন্তু কবে? মিথ্যে বলা হয়ে যাবে না তো?

ফিরে এসেছি ৬ মার্চ ২০.১৫ সময়ে। এবং নির্বিঘ্নে। দু:খ একটাই, ইমিগ্রেশন ও কাস্টমস চেক করতে গেদে সীমান্তে প্রায় তিন ঘণ্টা! দীর্ঘ সময় টিনের শেডের তলায় গুমোট গরমে বুড়োবুড়ি সেদ্ধ হলাম। চারদিক চৌকো খাঁচা। পোটলাপুটলি টেনে নিয়ে যাওয়া আর সেগুলো ফের টানা!

ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীতে নৌকায় যাত্রী পারাপার

চলতিপথে খালি হুমড়ি খাওয়া। দর্শনায় দেশিবিদেশি মিলিয়ে বারোটা কাউন্টার। এখানে একঘণ্টা কম। শুনেছি, বিদেশে নাকি গাড়ির মধ্যেই চেকিং। এই দুই দেশ অন্তত তেমন না-হোক, যাতায়াতে সময় এবং দুর্দশা কমানোর জন্য যদি একটু ভাবেন, জার্নিটা সুখের হয়!

শেষ দৃশ্য

'তুই এত কামাই করিস ক্যা রে?' বালকস্কুলে প্রায়ই শুনতাম। শুধু স্যার নয়, বন্ধুরাও জানতে চাইত। অনেক মিথ্যে বলেছি। সত্যি যেটা, তা মায়ের অন্তিমযাত্রার আগের দিনগুলোয় মানুষ যেমন কাটায়, মায়েরও তেমন অবস্থা তখন। তা দেখে স্কুলের পথে গিয়েও ফিরে আসতাম। মা বুঝেও বলতে পারত না। হয়তো ভেবেছে প্রাণটা যাওয়ার সময় তার ছোট ছেলেটা অন্তত কাছে থাক! তার জন্য কামাই হত। জীবনে পাঠমন্দিরে না-গিয়েও যদি বেঁচে থাকা জীবনে মা থাকে, তবে সেই অঙ্গীকারে রাজি হতাম।

দেখা হল জনৈক মুসলমান ব্যক্তির সঙ্গে। আরবদেশে রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। কলকাতা যাচ্ছেন স্ত্রীকে চিকিৎসা করাতে। বাংলাদেশের ডাক্তারের সন্দেহ, লিভারে ক্যান্সার।

বাংলাদেশ ফেরতকালে কামরার মানুষটিকে দেখে আমার বাবা মনে হচ্ছিল। এমন করে কত বার এমন ভাবেই মায়ের মাথায় হাত রেখে কলকাতা ডাক্তার দেখাতে আনত না?

লেখাটা এ জন্য নয়। গেদে সীমান্তের চেকিং-এ অপেক্ষারত দীর্ঘ সময়ে এক জন নানান পরামর্শ দিচ্ছেন। কানে এল, কলকাতার দুর্নামধারী এক বেসরকারি হাসপাতালের নাড়িনক্ষত্র বুঝিয়ে দিচ্ছিল। এমনকী কলকাতা স্টেশন থেকে এঁদের নিয়ে যাওয়ারও ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। চেন্নাই যাওয়ার দরকার কী!

ভাবছিলাম, লোকটা কী করে জানল? আর কাউকে ঠিক করে এসেছে? অভিবাসন দফতর কিংবা পুলিশ কিছু খোঁজ পায় না? সরল নাগরিকদের এমন প্রতারণা খুবই কষ্টের। অনেক সহায়হীন মানুষ আসেন ভারতে সুস্থ হওয়ার আশায়। পথেই যে এমন ফাঁদ! কী সুন্দর বাক্যালাপ! যেন ঈশ্বরই পাঠিয়েছে তাকে!

কিছু সাবধান করার ইচ্ছেয় বলতে যাব, স্ত্রী অণিমা বলল, এ সবে যেও না। কিন্তু কী করে থেমে থাকি? ও দিকে তাঁর ফোনে চার্জ ফুরিয়েছে। আমাদের কারও চার্জার লাগছে না। ছিটমহল থেকে তাঁর শ্যালক আসবেন। কলকাতা স্টেশন আসতে চলল, ফোনে কিছুতেই লাগছে না। অথচ প্রথম ভারতে আসা।

আমাদের নিতে ছোট ছেলে এসেছিল। ওর মা তো দীর্ঘ ব্যবধানের স্নেহে জড়িয়ে চুম্বন করল। পিছন ফিরে দেখলাম, বাবার মতো মানুষটি তাঁর স্ত্রীকে প্রায় পাঁজাকোল আর সুটকেশ নিয়ে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে স্টেশনে ঢুকছেন। দালাল লোকটা কাছাকাছিই তো ছিল!

বাড়ি এসে কত গল্প! রাত বেশি গভীর হয়নি।

ভাবি ছিটমহল থেকে পৌঁছেছে ওই শ্যালক? নাকি এখনও অপেক্ষায়? অথবা হাসপাতালের প্রাইভেট কার নিয়ে গেল তাঁদের?

পদ্মা বহমানা

গাংচিল প্রকাশনার প্রাণপুরুষ ও আনন্দবাজার গোষ্ঠীর প্রাক্তন কর্মী অধীর বিশ্বাস ভালোবাসেন ছোটদের জন্য কলম ধরতে। দীর্ঘদিন ধরে লিখছেন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। সম্প্রতি প্রকাশ করছেন গাংচিল পত্রিকা। প্রকাশিত বই – 'পুণ্য গঙ্গার কাছাকাছি,' 'চলো ইন্ডিয়া,' ছোটদের চার খণ্ডে 'উড়োজাহাজ' ইত্যাদি। ছোটদের লেখার জন্য পেয়েছেন 'বিদ্যাসাগর' পুরস্কার। ছেলেবেলা কেটেছে ওপার বাংলায়। কলকাতায় এসে বস্তিজীবনে সংগ্রাম করেছেন রোজের বেঁচে থাকার জন্য। দীর্ঘদিনের ইচ্ছা ছিল জন্মভূমিকে ফিরে দেখার। সেই ইচ্ছাপূরণের কাহিনিই লিখলেন এবার আমাদের ছুটি-তে। তাঁর লেখা প্রথম ভ্রমণকাহিনি।

দিনে দিনে বর্ধমানে

তপন পাল

-১-
মন উচাটন
চলো বৃন্দাবন
কিন্তু যাই কী করে? পরপর চারটে রবিবার চলে গেল, আমি ঘরে বসা। বাড়ি থেকে বেরোতে দিচ্ছে না; বড্ড গরম। তা গরম কি ভারতবর্ষে এই প্রথম পড়ছে? অবশেষে প্রায় হাতে পায়ে ধরে বেরোবার ব্যবস্থা করা গেল; খুব দূরে নয়, বর্ধমান। রেলগাড়িতে নয়, নিজের গাড়িতে, নিজে চালিয়ে নয়, সারথির হাতে। ঘুরতে বেরিয়ে সঙ্গে কেউ থাকলে আমার বিরক্ত লাগে, কিন্তু কীই বা করা যাবে! এযাত্রা কপালে সুখ নেই বোঝা যাচ্ছে।

১৪ই জুন, ২০১৭। সাতটায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিমানবন্দর। বর্ধমানে উড়োজাহাজ যায় না জানি, তবে চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি! তারপর উড়োজাহাজ না পেয়ে ভেসে পড়লাম বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়েতে। রেললাইন, রাস্তা, নদী সব নীচে, আমরা উড়ে চলেছি উড়োজাহাজের মতই প্রায়। তবে বেশিক্ষণ সুখ কপালে সইল না, ডানকুনির কাছাকাছি গিয়ে ভূমিস্পর্শ। ডাইনে বেঁকে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে। পথিমধ্যে শক্তিগড়ে বাধ্যতামূলক ল্যাংচা ও শশাভক্ষণ, বিস্তর রেললাইন, খাল, রাস্তা ডিঙিয়ে বর্ধমান।

বর্ধমান শহরটা আমার খুব কাছের। তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা ১৯৬৮-র ডিসেম্বরে। আমার তখন পঞ্চম শ্রেণী। মধুপুরে স্কাউটের অ্যাসোসিয়েশন ক্যাম্প সেরে ফেরার সময় স্কাউটমাস্টার নির্মলদা সেবার আমাদের ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলেন যথাক্রমে আসানসোল, রানিগঞ্জ, দুর্গাপুর ও বর্ধমান। কেন? তদানীন্তন চেতনায় মধুপুর ছিল অনেক দূর - সুদূর পশ্চিমে। অতদূরে যখন যাচ্ছিই, আর আসা হয় কী না হয়, তাই এসেছি যখন, তখন ঘুরে যাওয়াই ভাল - এই ছিল মানসিকতা। তারপর কিছু না হলেও পঞ্চাশবার এই শহরে এসেছি। বর্ধমান চিরকালই আমার প্রিয় দিনান্তভ্রমণ গন্তব্য। রেলগাড়ি দেখা হয়, আড়াই ফুটের ন্যারোগেজ রেলগাড়ি চালু থাকাকালীন এখান থেকেই কাটোয়া যেতাম। তারপর বলগনা অবধি ব্রডগেজ হল। এখন তো আড়াই ফুটের ন্যারোগেজ রেলগাড়ি স্মৃতির সম্বল।

বর্ধমানের ইতিহাস অতিপ্রাচীন। গলসির মল্লসারুল গ্রামে প্রাপ্ত ষষ্ঠ শতকের তাম্রলিপিতে বর্ধমান নামের উল্লেখ আছে। ১৬৫৬ থেকে ১৯৫৬ বর্ধমান ছিল বর্ধমানের রাজার শাসনে। প্রথমে মুঘল, পরবর্তীকালে ব্রিটিশের দাক্ষিণ্যপুষ্ট রাজপরিবারটি আদতে পঞ্জাবী। আকবরের রাজত্বকালে (১৫৫৬ - ১৬০৫) আবুল ফজল আর ফাইজির উৎপাতে তিতিবিরক্ত পির বহরম বর্ধমানে আস্তানা গাড়েন। সঙ্গী পান জয়পালকে। সংহতির, সম্প্রীতির, সহচেতনার সেই ধারা আজও প্রবহমান। বর্ধমান রেলস্টেশন চালু হয় ১৮৫৫-তে। ১৮৬৫ সালে বর্ধমান পৌরসভা গঠিত হয়, সম্ভবত ১৮৬৩ সালে কালাজ্বরের মহামারী ব্রিটিশদের জনস্বাস্থ্য নিয়ে ভাবতে বাধ্য করেছিল। । ১৮৫৫ - ৫৭-র সাঁওতাল বিদ্রোহে রাজারা ব্রিটিশদের খুব সাহায্য করেছিলেন। ১৯০৫-তে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে উত্তাল হয়েছিল বর্ধমান। রাজ কলেজের কিছু ছাত্র 'বন্দে মাতরম' বলার দায়ে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। ১৮ মার্চ, ১৯২৩ খিলাফত আন্দোলনের জেরে সারা বর্ধমানে হরতাল।

-২-
এবার বর্তমানে। শহরে না ঢুকে ওই সড়ক বরাবর এগিয়ে বাঁকা নদী আর ডিভিসি খাল পেরিয়ে কাঞ্চননগরের কঙ্কালেশ্বরী কালীবাড়ি। অনেকখানি জায়গা নিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কয়েকটি মন্দির। রক্ষণাবেক্ষণ চমৎকার। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে (১৩২০ বঙ্গাব্দ) দামোদর নদের বন্যার সময় বর্ধমান শহরের পশ্চিমে নদীগর্ভ থেকে এই কালীমূর্তি পাওয়া যায়। মূর্তিটির বয়স অনির্ণীত। অপ্রথানুগ মূর্তিটি তিন ফুট চওড়া ও পাঁচ ফুট লম্বা একটি অখণ্ড পাথর খোদিত অষ্টভূজা বিগ্রহ। গলায় নরমুন্ডমালা, পদতলে শিব ও তাঁর দুইপাশে দুই সহচরী। আটটি হাতে নরমুণ্ড, শঙ্খ, চক্র, ধনু, খড়্গ, পাশ ইত্যাদি। অষ্টভুজা মুণ্ডমালাধারিণী শূলপাণিনী দেবীর শরীরের সবকটি অস্থি দৃশ্যমানা; তাই তিনি কঙ্কালেশ্বরী। পোড়ামাটির প্যানেলশোভিত মন্দিরটি তন্ত্রমতে প্রতিষ্ঠিত বলে জনবিশ্বাস।

শহরে ফিরে বর্ধমানেশ্বর শিব তথা মোটা শিব। ১৯৭৩ সালে আলমগঞ্জের ভিখারিবাগানে মাটি খুঁড়তে গিয়ে এই অতিকায় শিবলিঙ্গটি পাওয়া যায়, পণ্ডিতদের মতে এটি দ্বাদশ শতকের। পশ্চিমবঙ্গের আর কোথাও এত বড় শিবলিঙ্গ আছে বলে জানা নেই। ওড়িশার ভূষণ্ডেশ্বর শিবলিঙ্গের সঙ্গে ইনি তুলনীয়।

শহরের বুকে পাশ্চাত্য স্থাপত্যের এক উদাহরণ চার্চ মিশনারি সোসাইটি কর্তৃক নির্মিত ক্রাইস্টচার্চ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্যাপ্টেন চার্লস স্টুয়ার্ট এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বর্ধমানের মহারাজার কাছ থেকে বাৎসরিক সাড়ে বারো টাকা অনুদান পেতেন বলে প্রকাশ।

শহরের প্রায় কেন্দ্রস্থলে বিজয় তোরণ। ১৯০৩ সালে বর্ধমানরাজ বিজয়চাঁদ মহতাবের আদেশক্রমে, লর্ড কার্জনের আগমন উপলক্ষে নির্মিত। জনমানসে প্রবল বিশ্বাস এটি মুম্বইয়ের 'গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া'র আদলে তৈরি; রিকশাওয়ালারা প্রবল আত্মবিশ্বাসে লোককে তা বলেও থাকে। এদেশে ইতিহাসবিদ হতে তো আর পড়াশোনা করতে হয় না। বৃন্দাবনে গেলে পাণ্ডারা ইস্পাতের দোলনা দেখিয়ে বলে এই দোলনায় রাধা-কৃষ্ণ দুলতেন। তারপর খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যায় তাতে টাটা স্টিলের ছাপ মারা। মুম্বইয়ের 'গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া' নির্মিত ১৯২৪ সালে, বিজয়তোরণের অনেক পরে। বর্ধমানের রাজ ইতিহাসের একটা অঙ্গ হল বিজয়তোরণ। পাশেই রামপ্রসাদের লস্যির দোকান। দুটিই এখন অতিবিখ্যাত; 'সোনার হাতে সোনার কাঁকন, কে কার অলঙ্কার।' রামপ্রসাদের দোকান বিজয়তোরণের অলঙ্কার, না বিজয়তোরণ রামপ্রসাদের দোকানের!

এক রাজকন্যের আত্মহত্যার সকরুণ আখ্যানবিজড়িত বারদুয়ারি মহারাজ কিরীটীচাঁদ কর্তৃক নির্মিত বারো দরজার প্রাসাদ; যদিও এক্ষণে একটিই দৃষ্ট। বরদা ও চিতুয়ার জমিদার বাবুরা বর্ধমানের মহারাজার প্রাসাদ দখল করেন, তাদের অত্যাচারে রাজকন্যা আত্মহত্যা করেন। প্রতিশোধ নিতে মহারাজ কিরীটীচাঁদ বরদা ও চিতুয়া দখল করে বিজয়স্মারকরূপে এই প্রাসাদ নির্মাণ করেন। জানি না এই আখ্যানের ঐতিহাসিক প্রাসঙ্গিকতা কতটুকু।

দামোদর নদ সদরঘাটের সেতুর ওপর থেকে দেখা। তারপর ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখা মৃগদাব, বর্ধমানরাজ বিজয়চাঁদ মহতাবের সমাধি, বিজয়বাহার, গোলাপ বাগ (১৮৮৪ তে স্থাপিত, রোমান গথিক স্থাপত্যের দারুলবাহার প্রাসাদ এখানেই। কৃষ্ণসায়র ৩৩ একর জমি নিয়ে - ১৬৯১ সালে নির্মিত এই কৃত্রিম হ্রদটি এখন পুরোদস্তুর পার্ক। নবাব বাড়ি ৩০০ বছরের পুরনো, ইন্দো-সিরিয়ান স্থাপত্যের নিদর্শন। রাজবাড়ি মহতাব মঞ্জিল ১৮৫১ সালে নির্মিত; এখন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, সরকারি অফিস। রমনা বাগান গোলাপ বাগের পূর্বদিকে, রানি ব্রজকিশোরী নির্মিত রাণীসায়র।

-৩-
এর আগে অনেকবারই বর্ধমানে গিয়েছি, কিন্তু কোনবারেই সর্বমঙ্গলা মন্দিরে ভোগ খাওয়া হয়ে ওঠে নি; কারণ ভোগ খেতে হলে কুপন কাটতে হয় সকাল নটার মধ্যে। এবারে এক সহৃদয় বন্ধু দায়িত্ব নিয়েছিলেন, আগের দিন কুপন কেটে রেখেছিলেন। অতএব দুপুর সাড়ে বারোটার মধ্যে আমি মন্দিরে।

মন্দির নির্মাণ ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহারাজা মহতীচাঁদের কন্যা ধনদেহি দেবী। প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৭৪ সালের ২ আষাঢ়। অনেকখানি জায়গা জুড়ে মন্দির প্রাঙ্গণ; তার মধ্যমণি বিশাল নবরত্ন মন্দির। মন্দিরে প্রবেশদ্বারের উত্তরে গর্ভগৃহে আসীন ধনেশ্বরী শক্তিদেবী ও ধনেশ্বর শিব। সর্ব্বমঙ্গলা মন্দির প্রাঙ্গণে শিবমন্দির পাঁচটি; তন্মধ্যে আটচালা শিবমন্দির দুটি নির্মিত হয়েছিল রাজা চিত্রসেনের আমলে। নাটমন্দির সংলগ্ন আরও তিনটি শিবমন্দির। নাটমন্দিরের দেওয়ালে উৎকীর্ণ প্রাকারলিপি নিম্নরূপঃ
বর্ধমানাধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্ব্বমঙ্গলা মন্দির অবিভক্ত বাংলার প্রথম "নবরত্ন" মন্দির দেবী কষ্টি পাথরে অষ্টাদশভুজা সিংহবাহিনী মহিষমর্দ্দিনী লক্ষ্মীরূপী মূর্ত্তি।

১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানের মহারাজ কীর্ত্তিচাঁদ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। নবরত্ন মন্দিরের গর্ভগৃহে রূপার সিংহাসন দেবীর আসন। কষ্টিপাথরে খোদিত দেবী অষ্টাদশভূজা। মূর্তির চরণতলে মহিষ। মহিষমর্দিনী মূর্তি এখানে সর্ব্বমঙ্গলা নামে পূজিত হন। মন্বন্তরা মূর্তি নামেও এই বিগ্রহ অভিহিত। মূর্তির নীচে অস্পষ্ট কিছু একটা লেখা আছে। যার পাঠোদ্ধার করা এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। এই মন্দিরে সূর্যদেব নিত্যপূজিত। লোকবিশ্বাসে, বর্ধমানের উত্তরে সর্ব্বমঙ্গলা পল্লীর এক বাগদি বাড়িতে ছিল দেবীবিগ্রহটি। বাগদীরা ছোট এক টুকরো পাথরখণ্ডের ওপর গেঁড়ি, গুগলি, ঝিনুক, শামুক ভাঙতেন। চুনোলিরা পরে এসে খোলগুলো কুড়িয়ে নিয়ে যেত চুন তৈরি করার জন্য। একদিন গুগলি, ঝিনুকের সাথে ভুলক্রমে মতান্তরে দৈবী ইচ্ছায় পাথরখণ্ডটিও নিয়ে যায় চুনোলিরা। পোড়ানোর সময় খোলগুলি আগুনে পুড়ে গেলেও শেষপর্যন্ত অবিকৃত থেকে যায় কালো এক প্রস্তরখণ্ড। তারপর যেমনটি হয় আর কী! স্বপ্ন পাওয়া, দৈববাণী; সে এক হইহই কাণ্ড। চুনোলিরা প্রস্তরখণ্ডটি নিয়ে গেলেন এক ব্রাহ্মণের কাছে। ইতিমধ্যে বর্ধমানের মহারাজ চিত্রসেন রায় স্বপ্নে দেখেছেন এক দেবীমূর্তি তাঁকে আদেশ দিয়ে বলছেন দেবী অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছেন দামোদরের জলে। মহারাজ যেন দেবীকে উদ্ধার করে এনে প্রতিষ্ঠা করেন। রাজা মহারাজা মানুষ, দুয়েকটা স্বপ্ন না দেখলে, দু-চারটে মন্দির প্রতিষ্ঠা না করলে চলে! আর ঠাকুর দেবতারাও এমন একদেশদর্শী যে তারা কদাচ গরিবগুরবো লোককে স্বপ্ন দেন না, জানেন এদের স্বপ্ন দিয়ে লাভ নেই। সত্যিই! টাকার কী মাহাত্ম্য মাইরি!

অগত্যা সকাল হতেই ঘোড়া ছুটিয়ে দামোদরতটে। তদ্যপি ডিভিসি হয়নি; তাই কেউ বাধাও দিল না। গিয়ে দেখেন একটা লোক বাসন মাজছে। সমীপবর্তী হতে ভুল ভাঙল, রাজামশাই দেখলেন এক ব্রাহ্মণ একটি প্রস্তরখণ্ড মার্জনা করছেন। কোই মিল গ্যয়া। মহারাজ বিগ্রহটি চাইলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ নারাজ! তা রাজামশাই কী আর জানতেন না এই সব 'সিচুয়েশন' কেমন করে 'ট্যাকল' করতে হয়! তাই বংশপরম্পরায় ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাং তুলে খাওয়ার প্রতিশ্রুতি - মহারাজ প্রতিশ্রুতি দিলেন ওই ব্রাহ্মণই বংশপরম্পরায় দেবীর নিত্যপুজোর অধিকারী হবেন। ঝামেলা মিটল, সব ভাল যার শেষ ভালো। মহারাজ কীর্ত্তিচাঁদ নির্মিত মন্দিরে দেবী সর্ব্বমঙ্গলা প্রতিষ্ঠিত হলেন মহাসমারোহে। ব্রাহ্মণ পেলেন নিত্যপুজোর ভার। সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে। রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলে দেবীর উল্লেখ আছে। ফলে প্রাচীনত্ব নিয়ে কোনও সংশয় নেই। আমি বাউন্ডুলে মানুষ, মন্দিরে মসজিদে ঘুরে বেড়াই। তাই এরকম গল্প শুনে শুনে অভ্যস্ত। কারা এসব গল্প বিশ্বাস করে তাও জানি না। যারা লোকমুখে এই গল্পগুলির উদ্গাতা, তাঁদের কল্পনাশক্তির দীনতা প্রায়ই মনকে পীড়া দেয়। সব মন্দিরের গল্পই এক ধাঁচের, শুরু হলেই বলে দেওয়া যায় এরপর কী হবে – শোনার আগ্রহ অন্তর্হিত হয়। স্বপ্ন দেখা আর দৈববাণীর বাইরে আর কিছু ভাবা গেল না; গল্পগুলিকে করে তোলা গেল না কিঞ্চিৎ বাস্তবতাভিত্তিক,

মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন! তবে তাতে আমার কী এসে যায়! আমি তো এসেছি ভোগ খেতে!

মন্দিরে পৌঁছে দেখা গেল পংক্তিতে অনেকেই অপেক্ষমাণ। তিরিশ টাকায় পেটভরা, প্রায় বিয়েবাড়ির খাওয়া; কিন্তু কোন গরিবগুর্বো লোক চোখে পড়ল না; সম্ভবত আমারই চোখের দোষে। সবই পাটভাঙা ধুতিশাড়িতে, খনিজ জলের বোতল হাতে, গাড়ি চেপে ভোগ খেতে আসা উচ্চবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত মানুষ। এমনকি মন্দিরচত্বরে যারা ভিক্ষা চাইছেন তাদেরও পোশাক ও গাত্রবর্ণ দেখে ঠিক ভিক্ষুক বলে মনে হল না। মা তখন বাইরে, গর্ভগৃহ ধোয়ামোছা হচ্ছে। তা সাঙ্গ হতেই রেশমের রাজছত্রের ছায়ায় মা মন্দিরে ফিরলেন। ভোগও শুরু হল। পোলাও, আলুভাজা, পটলভাজা, শাকভাজা। ভাত, শুক্তো, সব্জি সহযোগে ডাল, আলু ফুলকপির তরকারি, পায়েস। প্রতিটি পদই অতীব সুস্বাদু, এবং দেওয়াও হচ্ছে অনেকবার করে। ফলে আমার মামার মত বিয়েবাড়িতে গাণ্ডেপিণ্ডে খেয়ে 'আর একটু খাওয়ার ইচ্ছে ছিল; দিল না' বলার কোনও সুযোগ নেই। দুপুরে খিদের মুখে গরম ভাত পেয়ে আমিও অনেকটা খেয়ে ফেললাম। পরিবেশনকারীরা সম্ভবত বুঝেছিলেন আমি বহিরাগত; আমাকে প্রসাদ সিন্দুর ফুল দিলেন আলাদা করে। তাঁদের সহৃদয় বদান্যতায় আমি মুগ্ধ হলাম। ঈশ্বর বলে যদি কেউ থাকেন, তিনি তাঁদের মঙ্গল করুন।

সকালে মন্দির খোলার পর মা মুখ ধোন, সরবত খান। তারপর মঙ্গলারতি। মঙ্গলারতির পর মা চৌকিতে বসে তেল মাখেন, তারপর পঞ্চামৃত দিয়ে স্নান, গহনা পরিধান ও সিংহাসনে উপবেশন। অতঃপর নিত্যপূজা। লুচি সহযোগে ব্রেকফাস্ট। এর মধ্যেই ভক্তরা পুজো দিতে থাকেন। বেলা সাড়ে বারোটা থেকে একটার মধ্যে অন্নভোগ, তৎপরে দিবানিদ্রা। বিকেলে মন্দির খোলে চারটেয়। সকালের মতই স্নান করে গহনা পরে সিংহাসনে। পুজো, সন্ধ্যারতি। রাতে লুচিভোগ। শীতলের পর শয়ন। রাত সাড়ে আটটায় মন্দির বন্ধ। সর্ব্বমঙ্গলার জমকালো পূজা হয় দুর্গাপূজায়, পাঁচদিন মেলা সহ। চোখ কান খোলা রাখলে বোঝা যায়, মায়ের আর্থিক স্বাস্থ্য ভাল। আর হবে নাই বা কেন! অত্যন্ত জাগ্রত এই দেবীর কাছে কোনও কামনা করে তা পূরণ হয়নি এমন কথা কোনও বর্ধমানবাসী কদাচ শোনেনি। যে কোনও উৎসব-অনুষ্ঠানে, বিবাহে, অন্নপ্রাশনে, পয়লা বৈশাখ ও অক্ষয়তৃতীয়ায় ব্যবসায়ীদের নতুন খাতার শুভসূচনায় বর্ধমানবাসী মায়ের কাছে একবার আসবেই।

খেয়ে উঠে বাদশাহি সড়ক ধরে কিঞ্চিৎ এগিয়ে তালিত, ডাইনে গুশকরার রাস্তায় উঠেই নবাবহাটের ১০৮ শিবমন্দির। প্রতি শিবরাত্রিতেই সাতদিন ধরে আরাধনা চলে প্রতিষ্ঠা কাল হতেই। রানি বিষ্ণুকুমারী এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ১৭৮৮ সালে। অনেকখানি জায়গা জুড়ে, চমৎকার রক্ষণাবেক্ষণ, চারিভিতে বড় বড় গাছ। ভরপেট খাওয়ার পর একটু লম্বা হতে মন আনচান করে।

শহরে ফিরে কমলাকান্ত কালীবাড়ি। কমলাকান্ত ভট্টাচার্য (১৭৭২ - ১৮২০) মহোদয়ের জন্ম মাতুলালয় বর্ধমানের চান্না গ্রামে। বর্ধমানের মহারাজ তেজচন্দ্র তাঁর উচ্ছৃঙ্খল পুত্র প্রতাপচন্দ্রকে শিক্ষা দীক্ষায় উপযুক্ত করে তোলার ভার দেন কমলাকান্তকে। বাড়ি তৈরি করে দেন লাকুড্ডিতে আর মন্দির করে দেন কোটালহাটে। কমলাকান্ত সেখানে কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পঞ্চমুণ্ডীর আসনে সাধনা করতেন। কিন্তু দুপুরবেলা, মন্দির তখন বন্ধ।

-৪-

এবার শেষ গন্তব্য। আমার বড় প্রিয়, বিষাদমাখা শের আফগানের সমাধি। পাঠক একবার কপালকুণ্ডলার তৃতীয় পরিচ্ছেদ - প্রতিযোগিনী-গৃহে স্মরণ করুন। 'এ সময়ে শের আফগান বঙ্গদেশের সুবাদারের অধীনে বর্ধমানের কর্মাধ্যক্ষ হইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। মতিবিবি বর্ধমানে আসিয়া শের আফগানের আলয়ে উপনীত হইলেন।' এই চত্বরের সঙ্গে আমার ভালোবাসা দীর্ঘকালের।

আলি কুলি ইস্তাজিউ ছিলেন পারস্যের শাসকের সফর্চি, অর্থাৎ খাদ্য পরিবেশক। শাসক দ্বিতীয় ইসমাইলের মৃত্যুর পর লোকটি ভাগ্যান্বেষণে কান্দাহার, মুলতান। প্রথমে মনসবদার, তারপর মুঘল দরবারের ছোটখাট সভাসদ। সভাসদ মির্জা ঘিয়াস বেগের স্ত্রীর মুঘল হারেমে যাতায়াত ছিল, প্রায়শই এমত সফরে তার সঙ্গী হতেন কন্যা মেহরুন্নিসা। সম্রাট আকবর নাকি কানাঘুষো শুনছিলেন যে মেহরুন্নিসার সঙ্গে যুবরাজ সেলিমের ইন্টু-মিন্টু চলছে। তখন মুঘল দরবারের সভাসদ আমির ওমরাহদের পরিবারের সদস্যদের বিবাহে সম্রাটের অনুমতি লাগত। ১৫৯৪এ সম্রাটের আদেশে মেহরুন্নিসার বিবাহ হল আলি কুলি ইস্তাজিউর সঙ্গে। এর মধ্যে শিকারে গিয়ে এক বাঘের হাত থেকে যুবরাজ সেলিমের প্রাণ বাঁচালেন আলি কুলি। যুবরাজ খেতাব দিলেন শের আফগান। ১৬০৫-এ সেলিম জাহাঙ্গির নাম নিয়ে সম্রাট হলেন, আলি কুলিকে জায়গিরদার করে পাঠালেন বর্ধমানে। আর রাজা মানসিংহকে সরিয়ে বাংলার সুবেদার করলেন দুধ-ভাই শেখ খুবু কুতুবুদ্দিন খান কোকাকে।

১৬০৭-এ সম্রাট শের আফগানকে দরবারে ডেকে পাঠালেন; অভিযোগ গুরুতর। তিনি নাকি কর্তব্যে অবহেলা করছেন, আফগান বিদ্রোহীদের সঙ্গে নাকি তার ওঠাবসা। শের আফগান গেলেন না। এমত অবাধ্যতা সহ্য করা যায় না; কুতবুদ্দিন যুদ্ধযাত্রা করলেন, আর সেই সঙ্গে ভাগিনেয় ঘিয়াসাকে পাঠালেন শের আফগানকে বুঝিয়েশুনিয়ে তাঁর কাছে নিয়ে আসার জন্য। ৩০ মে, ১৬০৭ শের আফগান গেলে কুতবুদ্দিনের বাহিনী তাকে বন্দী করার চেষ্টা করলেন। শের আফগান আক্রমণ করে আহত করলেন কুতবুদ্দিনকে। বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে কোতল করল শের আফগানকে। পরদিন কুতবুদ্দিন শের আফগানের অনুসারী হলেন। সেই থেকে পির বহরমের ধর্মস্থানে পাশাপাশি শুয়ে কুতবুদ্দিন ও শের আফগান।

দিন এখন অনেকটাই বড়, তবুও বিকেল ঘনায়।
বনস্পতির ছায়ায় আঁধার নামে তাড়াতাড়ি। অলসতায় আমি চত্বরে, গাড়ি আছে, বাড়ি ফেরার তাড়া নেই। পাশের পুকুরে তরঙ্গ ওঠে, একটা জলঢোঁড়া সাঁতরে চলে যায়। বসে থাকি।

শের আফগানের মৃত্যুর পর রূপবতী মেহরুন্নিসা কন্যাকে নিয়ে বাহিনীর সঙ্গে দিল্লির পথে। তখন নাকি শের আফগানের ভূত তার পশ্চাদ্ধাবন করে, ডাকতে থাকে, 'মেহের, মেহের!' ভীত সেনাধ্যক্ষ শিরনি চড়ান, চেরাগ জ্বালান মঙ্গলকোটের দরগায়। মুখ নামিয়ে চলে যান মৃত শের আফগান। আজও নাকি বর্ধমান থেকে মঙ্গলকোট অবধি বাদশাহি সড়কে রাতের নিশুতিতে শোনা যায় সেই মরিয়া আর্তনাদ, 'মেহের, মেহের।'

খুব আশ্চর্য লাগে। অভিজাত এক মহিলা কিভাবে চলে যেতে পারেন স্বামী হন্তারকের হাত ধরে! প্রতিশোধস্পৃহা জাগে না? মেহরুন্নিসার কি ইচ্ছা হয়নি মরে যেতে, ইচ্ছা হয়নি চিৎকার করে গাল পাড়তে, অভিশাপ দিতে? ক্রুদ্ধা নারীর অভিশাপই তো ফলে যায় বলে শুনেছি; গান্ধারী শ্রীকৃষ্ণ,

অম্বা ভীষ্ম, ঘসেটি বেগম মিরন... উদাহরণ তো অনেক।

একটা গল্প শুনুন। ইরাকের আরব শাসক হজ্জাজ খলিফা ওসমানের (৬ নভেম্বর ৬৪৪ - ১৭ জুন ৬৫৬) অনুমতি নিয়ে মহম্মদ কাসিমকে পাঠালেন সিন্ধ বিজয়ে। রাজা দাহির, সিন্ধের তদানীন্তন রাজা, সিন্ধুতীরে অররের যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হলেন। তাঁর রানিরা সতী হলেন। এক রানি, রানি লদি, মহম্মদকে বিবাহ করলেন। রাজা দাহিরের দুই অবিবাহিতা কন্যা, রাজকুমারী সূর্যদেবী ও রাজকুমারী প্রমলদেবী প্রেরিত হলেন খলিফার কাছে, লুণ্ঠিত দ্রব্যসামগ্রীর এক পঞ্চমাংশের অংশরূপে। এই রাজকুমারী সূর্যদেবী মহম্মদ কাসিমের মৃত্যুর কারণ হয়েছিলেন। প্রতিহিংসাপরায়ণা রাজকুমারী খলিফার সম্মুখে নীতা হলে খলিফা তার রূপসৌন্দর্যে মোহিত হন। রাজকুমারী জানান যে তিনি খলিফার যোগ্য নন; কারণ তাঁর কাছে প্রেরিত হওয়ার পূর্বে তিনি মহম্মদ কাসিমের সান্নিধ্যলাভ করেছেন। তাই শুনে খলিফা তৎক্ষণাৎ আদেশ পাঠান মহম্মদ কাসিমকে চর্মাবৃত করে তা সেলাই করে যেন তার কাছে পাঠানো হয়। অনুগত কাসিম তা পালন করেন, বাগদাদের পথেই তার মৃত্যু হয়। নিজের ক্ষমতা জাহির করে রাজকুমারীর মন জিততে তার মৃতদেহ খলিফা রাজকুমারীকে দেখানও।

দিল্লি দরবার। সেখানে মা মেয়ে পারিবারিক আভিজাত্যের জোরে সম্রাট আকবরের প্রধানা পত্নী রুকাইয়া সুলতান বেগমের ব্যক্তিগত সহকারী। সেই সূত্রে মিনাবাজারে সম্রাট জাহাঙ্গিরের সঙ্গে দেখা, বাক্যালাপ। তারপর জল গড়ায়, ১৬১১-তে চৌত্রিশ বছরের মেহরুন্নিসা পরিণীতা সম্রাট জাহাঙ্গিরের সঙ্গে; নতুন নাম সম্রাজ্ঞী নূরজাহান - সম্রাট জাহাঙ্গিরের বিংশতিতমা তথা শেষতমা বৈধ স্ত্রী। লোকে বলে বিবাহের রাত্রে নাকি সম্রাট জাহাঙ্গির সারারাত নির্নিমেষ ও উৎকর্ণ, মেহরুন্নিসাকে দেখেছিলেন আর তার কথা শুনেছিলেন। তিনিই একমাত্র মুঘল মহিলা যার নাম মুদ্রায় উৎকীর্ণ, যার নামে মসজিদে শুক্রবার শুক্রবার খতবা পড়া হয়, যিনি সম্রাটের সঙ্গে ঝরোখায় প্রজাদের দর্শন দেন, ১৬২৬-এ বিদ্রোহী মোহব্বত খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যিনি হস্তীপৃষ্ঠে বাহিনীকে নেতৃত্ব দেন। চেষ্টা করেছিলেন যুবরাজ খুররমের সঙ্গে মেয়ে লাডলির বিয়ে দিতে, কিন্তু যুবরাজ রাজি হলেন না, তিনি তখন সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের আপন ভাইঝি মমতাজমহলের প্রেমমুগ্ধ। নূরজাহান তখন মেয়ের বিয়ে দিলেন সম্রাট জাহাঙ্গিরের অপর এক পুত্র যুবরাজ শাহ্‌রইয়ারের সঙ্গে।

২৮ অক্টোবর, ১৬২৭। সম্রাট জাহাঙ্গিরের মৃত্যু। সিংহাসন দখলের দৌড়ে জয়ী যুবরাজ খুররম, নাম নিলেন সম্রাট শাহজাহান, হত্যা করলেন ভ্রাতা শাহ্‌রইয়ারকে। বিড়ম্বিতা নূরজাহানের মৃত্যু ১৭ ডিসেম্বর, ১৬৪৫। তিনি শুয়ে আছেন লাহোরে। কবরের গায়ে ফার্সিতে তাঁর রচিত দুটি লাইন উৎকীর্ণ। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলায় অনুবাদ করেনঃ 'গরীব গোরে দীপ জ্বেলো না, ফুল দিও না কেউ ভুলে। শ্যামা পোকার না পোড়ে পাখ, দাগা না পায় বুলবুলে।'

-৫-

ঘড়িতে সোয়া ছটা, সূর্য ডোবার পালা। এবার উঠতেই হয়। ইচ্ছা ছিল ফেরার পথে জি টি রোড ধরে সিমলাগড়ের রেলকালীর মন্দির দেখার। মন্দিরটি রেল লাইনের পাশে হওয়ায় এমন নাম। কিন্তু তাহলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। অগত্যা যাত্রা শুরু। প্রথম বিরতি চার্নক হোটেলে, চা পানের। দ্বিতীয় বিরতি শক্তিগড়ে, ল্যাংচা কিনতে। একদম খালি হাতে বাড়ি ফেরা যায় নাকি!

গ্রন্থঋণঃ

১। Dictionary of Historical Places. Bengal. 1757 -1947, Department of History, Jadabpore University, PRIMUS BOOKS

২। লাডলী বেগম। নারায়ণ সান্যাল। ২০০৫ সংস্করণ দে'জ পাবলিশিং । প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬। ISBN 8176121835

৩। The Twentieth Wife. Indu Sundaresan. Washington Square Pres Publication ISBN 0743428188 2002

৪। The Feast of Roses. Indu Sundaresan Washington Square Press Publication ISBN 0743456408 2003

৫। চাচ নামা। পারসিতে লিখিত সপ্তম ও অষ্টম শতকের ভারতবিজয় কাহিনি।

৬। The Age of Wrath. Abraham Eraly. Penguin Vioking. ISBN 9780670087181)

৭। কিংবদন্তীর দেশে, সুবোধ ঘোষ। কলিকাতা নিউ এজ পাবলিশার্স। ১৯৬১

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অডিট ও অ্যাকাউন্টস বিভাগের কর্মী তপন পাল বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি এবং ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ফ্যান ক্লাবের সদস্য। ভালোবাসেন বেড়াতে আর ছবি তুলতে। 'আমাদের ছুটি'-র জন্যই তাঁর কলম ধরা।

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly , please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory .

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • W eb Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

যে বন কুয়াশা-ছাওয়া

কণাদ চৌধুরী

~ চটকপুরের আরও ছবি ~

শিয়ালদহ স্টেশন থেকে সন্ধের কোনও লোকাল ট্রেন ধরে যখন নিয়মিত ঘরে ফিরতে হত, তখন দার্জিলিং মেলের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হত স্টেশনে। এই একটা ট্রেন, যেটা দেখলেই উঠে পড়ার এক অদম্য বাসনা মনের ভিতর চাগিয়ে ওঠে। শোনা যায় পাহাড়ের আহ্বান আর চোখ বুজলেই মনের পর্দায় ভেসে ওঠে কেভেন্টার্সের বারান্দায় টেবিলের ওপর মিল্কশেকের গেলাস আর পেছনে নীল আকাশের প্রেক্ষাপটে কাঞ্চনজঙ্ঘার শুভ্র তুষার-কিরীট - আঃ, সেই চিরকেলে চেনা লোকের দার্জিলিং। পর্যটন-বিধ্বস্ত দার্জিলিং-এর ডাকে যদিও মন এখন আর তেমন করে সাড়া দেয়না, কিন্তু বেড়াতে যাওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গে এখন রয়েছে আরও অনেক ছোট-বড় নানান জায়গা। সেখানে যাওয়ার জন্যেও রয়েছে হরেক কিসিমের ট্রেন, তবুও ওদিকে যেতে হলে দার্জিলিং মেলই এখনোও আমার প্রথম পছন্দের গাড়ি। সমস্যা একটাই। টিকিট কাটতে সামান্য বিলম্ব হলেই আইআরসিটিসি-র পোর্টাল থেকে উত্তরবঙ্গগামী প্রায় সব ট্রেনে "ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই" আওয়াজ উঠতে থাকে। এবারেও তার ব্যতিক্রম হল না। অবশেষে টিকিট মিলল পদাতিকে, যাবার সময় স্থির হল ফেব্রুয়ারি মাসের শেষাশেষি, যেতে হবে সেই দার্জিলিং-এর পথ ধরেই, তবে এবারের গন্তব্য দার্জিলিং নয় - তার সমীপবর্তী এক ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম, নাম যার চটকপুর। এই গ্রামটির কথা প্রথম শুনিয়েছিল রামনাথ, যার গাড়িতে ও ব্যবস্থাপনায় বছর কয়েক আগে ডুয়ার্সে কয়েকদিন ঘোরাঘুরি করেছিলাম।
"দার্জিলিং তো অনেকবার গিয়েছেন - এর পরেরবার আসুন, নিয়ে যাব চটকপুর।"
"কী আছে চটকপুরে?"
"কিছুই নেই, শুধু পাহাড় আর জঙ্গল, তবে দেখবেন, ভাল লাগবে।"
চটকপুর নামটা মাথায় টুকে রাখা ছিল সেই থেকেই, তবে পালে হাওয়া দিল আমাদের কন্যা। তার মুখ থেকেই শুনলাম চটকপুর ভ্রমণের হাতে-গরম গল্প। সেই দরাজ সার্টিফিকেট শুনেই শেষে ঠিক হল, চলো এবার তবে চটকপুর।

পাহাড়ে বেড়াতে গেলে মনের কোণে একটা আশঙ্কা সর্বদাই খচখচ করতে থাকে, সেটা হল পাহাড়ের খামখেয়ালি আবহাওয়া অনুকূল থাকবে তো? ভেবেছিলাম, এই ফাগুন মাসে পাহাড়ে কি আর বৃষ্টি পাব? দেখলাম বিধি বাম। যাত্রার দিনকয়েক আগে থেকেই গুগুল ওয়েদার জানাতে থাকল যে হাওয়া বিশেষ সুবিধের নয়, গন্তব্যে মেঘ-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গবাসী বন্ধু-স্বজনেরা জানালেন বৃষ্টি হচ্ছে বটে ওদিকে মাঝে মধ্যেই। মেঘ বা রৌদ্র যাই থাক কপালে, আমাদের পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুসারে বেরিয়ে পড়তেই হল নির্দিষ্ট দিনে। সারা রাস্তা দিব্যি চলল গাড়ি, কিন্তু নিউ জলপাইগুড়ির কিছু আগেই পদাতিক কোনও এক অজ্ঞাত কারণে স্থাণু হয়ে রইলেন দীর্ঘ সময়। নড়েনও না, চড়েনও না, ওদিকে স্টেশন থেকে আমাদের গাড়ির সারথি ঘনঘন ফোনে জানতে চাইছেন "আপলোগ কিধর হ্যায়?" বোধহয় অন্য ট্রিপ ধরা রয়েছে, আমাদের দেরি তার চাপ বাড়িয়ে তুলছে ক্রমাগত, আর আমরা ভাবছি হ্যায় তো কাছেই, কিন্তু পদাতিককে টা-টা করে ট্রেন থেকে নেমে যে হাঁটা মারব সে উপায় তো নেই। অগত্যা বসে বসে প্রহর গোনা, এই ছাড়ল, এই ছাড়ল - দেখতে দেখতে পুরো একটি ঘণ্টা মাইনাস করে তবে ট্রেন স্টেশনে এন্ট্রি নিলেন। আমাদের গাড়ির সারথির নাম অমল মিনজ, তার গাড়িতে লাগানো রিয়াল মাদ্রিদ ক্লাবের পতাকা আর ব্যানার স্পষ্টই জানিয়ে দিচ্ছে তার ফুটবল আনুগত্য কোন দিকে ধাবমান। শুধু তারই নয়, আরও অনেক গাড়িকেই দেখছি ইউরোপের নানান ফুটবল দলের পতাকা বহন করছে, কেউ বার্সেলোনা তো কেউ বা ম্যান-ইউ - মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গলের মত দেশি দলের কোনও জায়গাই নেই। অমলের মাথার চুলের ছাঁটও ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর ঢঙে স্পাইক করা। মনে মনে বললাম, বাবা আর যাই কর, পাহাড়ি রাস্তায় গাড়িটা নিয়ে রোনাল্ড-র ডজ দেখিও না।

শিলিগুড়ি এখন আর মোটেও পাহাড়ের পদপ্রান্তে অবস্থিত ছোট্ট শহরটি নেই, প্রস্থে ও দৈর্ঘে সে বেড়ে চলেছে নিরন্তর। এখন শিলিগুড়িতে শপিং মল, মাল্টিপ্লেক্স, বড় বড় হাউসিং কমপ্লেক্স চোখে পড়াটা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, শহরের সীমানা ছাড়াতে সময়ও লাগে বেশ কিছুক্ষণ। তিনটে রাস্তার যে কোনও একটি দিয়ে যাওয়া যায় দার্জিলিং, আমাদের গাড়ি ধরল রোহিণী রোড। পাহাড়ে গা বেয়ে উঠছে গাড়ি, মসৃণ সুন্দর রাস্তা, জানলার বাইরে তাকালে কিছুটা দূর অবধি দৃশ্যমানতা বেশ পরিষ্কার। আকাশও মেঘমুক্ত, বৃষ্টির কোনও চিহ্নমাত্র নেই, তবে দূরে একটা ঘন কুয়াশার চাদর টাঙানো রয়েছে নিচ থেকে ওপর অবধি, তুষারশৃঙ্গ দর্শনের পথে আপাতত সেটাই সর্বপ্রধান অন্তরায়। প্রথম যাত্রাবিরতি হল রাস্তার ধারেই কার্শিয়ং ট্যুরিস্ট লজে। কাঠের প্যানেলে সাজানো সুন্দর অভ্যন্তর, সুগন্ধি দার্জিলিং চা পরিবেশিত হল দুধ-সাদা পেয়ালা-পিরিচে, একেবারে সাহেবি কেতায়। ভাল দার্জিলিং চায়ের আসল স্বাদ-গন্ধ পেতে হলে সেটা দুধ-চিনি ছাড়া সেবন করাটাই বিধেয়, সঙ্গে পাওয়া গেল গরম-গরম সুস্বাদু মোমো, প্রাতরাশ নেহাত মন্দ হলনা। এর পর টুং হয়ে সোনাদা থেকে মূল রাস্তা ছেড়ে গাড়ি বাঁক নিল ডানদিকে। প্রথমে কিছুক্ষণ মনে হচ্ছিল একটা দেওয়াল বেয়ে উঠছে গাড়ি, এতটাই খাড়া চড়াই। চটকপুর গ্রামটি মূল সড়কপথ থেকে প্রায় আট কিমি দূরে। গাড়ি চলার মত রাস্তা রয়েছে বটে, তবে সেই পথের অবস্থা বেশ করুণ, এমন কি শোচনীয় বললেও কম বলা হয়। উত্তাল ঢেউয়ে নৌকো যেমন মোচার খোলার মত দোলে, শুকনো রাস্তায় আমাদের সুমোও তেমনটি দুলে দুলে চলল। আপার সোনাদা পার করে বাকি রাস্তায় শুধু জঙ্গল, পথে লোকালয় বড় একটা নজরে এল না, পথের শেষে প্রথম চোখে পড়ল একটি ইঁট-রঙের তোরণ, লেখা রয়েছে - চটকপুর ইকো-ভিলেজ আপনাকে স্বাগত জানায়।

সমুদ্রতল থেকে ৭৮৮৭ মিটার ওপরে সিঞ্চল সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ভিতরে অবস্থিত এই চটকপুর গ্রাম। মাত্র ষোলোটি পরিবারের একশোরও কম মানুষের বসবাস চটকপুরে। কোনও এক সময়ে জঙ্গলের কাঠ কেটে তার চোরাচালানের জন্যই এই গ্রামটির কুখ্যাতি ছিল। বনদপ্তরের উদ্যোগে

এবং গ্রামবাসীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে এখানে চালু করা হয় ইকো-ট্যুরিজম এবং হোম-স্টের ব্যবস্থা। এখন জৈব-পদ্ধতিতে চাষবাস এবং ভ্রমণার্থীদের পর্যটন পরিষেবা দেওয়াটাই গ্রামের মানুষজনের জীবিকার্জনের প্রধান দুটি উপায়। চটকপুর ইকো-ভিলেজে রয়েছে বন-দপ্তরের মালিকানাধীন দুটি পাশাপাশি কটেজ, কটেজ দুটিতে টয়লেট-সংলগ্ন মোট চারটি সুদৃশ্য কাঠের ঘর। ঘরগুলির অভ্যন্তর সুন্দর করে সাজানো, রয়েছে গিজার এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত অর্থের বিনিময়ে মিলতে পারে রুম-হিটার। ঘরগুলির সামনে একচিলতে ফাঁকা জায়গা, রান্নাঘর এবং তৎসলগ্ন খাওয়ার ঘরটি রয়েছে সেখানেই। পাশে একটি ছোট দোকান, চা-কফি ছাড়াও আরও কিছু কিছু জিনিস মেলে সেই দোকানে। দোকানের মালিক এক অবসরপ্রাপ্ত ফৌজি, দোকান-সংলগ্ন তার বাড়িটিতেও রয়েছে হোম-স্টের ব্যবস্থা। তারপরেই পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ডাইনে বাঁয়ে নেমে গিয়েছে ধুপি গাছের ঘন জঙ্গল আর কটেজ দুটির পিছনে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ধাপে-ধাপে উঠে গিয়েছে পাকদণ্ডী, সেই পথ গ্রামের ভিতর দিয়ে আপনাকে নিয়ে যাবে ওপরের ওয়াচ-টাওয়ারটিতে, যেখান থেকে সূর্যোদয়ের কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপ নাকি টাইগার হিলকেও হার মানায়। চটকপুরের অন্যান্য হোম-স্টে গুলি রয়েছে ওই গ্রামেরই বিভিন্ন বাড়িতে, সেখানেও ব্যবস্থা ভালোই, তবে ঘরের সংলগ্ন টয়লেটের সুবিধা হোম-স্টেগুলিতে অনুপস্থিত। বন-দপ্তরের ঘরগুলি দেখাশোনার ও রান্নাবান্নার দায়িত্বেও রয়েছেন কয়েকজন গ্রামবাসী। দ্বিপ্রাহরিক ভোজনে পাওয়া গেল ভাত, ডাল, নেপালি আচার, একটি সবজি এবং ডিম; রাতে চিকেন মিলবে - জানালেন ম্যানেজার। পদের সংখ্যা বেশি না হলেও খাবার সুস্বাদু, পরিবেশনও সুচারু, এবং প্রায় সবটাই স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কাঁচামাল দিয়ে তৈরি। খাবার ঘরের পাশের খোলা জায়গায় একটি বসার জায়গা করা রয়েছে, যেখানে বসে কুয়াশা-আকুল পাইনবনের স্বাদ-গন্ধ উপভোগ করে কাটিয়ে দেওয়া যায় অনেকটাই সময়। কটেজের সামনে দিয়ে পথ গিয়েছে নেমে সেই বনের ভিতর দিয়ে, পায়ে-পায়ে চলে যাওয়া যায় টাইগার হিল, তবে আমরা আর সে চেষ্টা করে দেখিনি। সেই পথেরই এক প্রান্তে রয়েছে গ্রামের ছোট্ট স্কুলবাড়িটি, স্কুলে দুজন শিক্ষক থাকলেও বর্তমানে ছাত্র রয়েছে মোটে একটি।

চটকপুরের প্রধান আকর্ষণ তার অমলিন প্রাকৃতিক পরিবেশ। বাইরের পৃথিবীর কলকোলাহলের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছেদ করে নির্জনতার মধ্যে পাহাড় ও অরণ্যের যুগলবন্দী যারা উপভোগ করতে ইচ্ছুক, কোনও সন্দেহ নেই চটকপুর তাদের পক্ষে একটি অতি আদর্শ জায়গা। ঘরে টিভি নেই, মোবাইলের সিগন্যাল অতি দুর্লভ। লাগামছাড়া পর্যটনের ফলশ্রুতিস্বরূপ জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে পর্যটকের যে জোয়ার আসে, মানুষের সেই ঢল এখনও এখানকার পরিবেশকে গড়িয়াহাটের চৈত্র সেলের বাজারে পরিণত করেনি। পক্ষীপ্রেমীদের জন্যেও চটকপুর একটি আকর্ষণীয় জায়গা, পাখিরা প্রচুর ডাকাডাকি করে তাদের অস্তিত্বের কথা জানান দিচ্ছিল প্রতিনিয়তই। শোনা গেল, আকাশ পরিষ্কার থাকলে চটকপুর থেকে দেখতে পাওয়া যায় সান্দাকফু, যারা এখান থেকে ট্রেক করে টাইগার হিল যান, তাদের নাকি পথে চোখে পড়ে মাউন্ট এভারেস্টের এক ঝলক। কটেজের সামনে ও পিছনের পাহাড়ি রাস্তায় আর পাইনের বনের প্রান্তে ইতস্তত পদচারণায় কেটে গেল অলস সময়। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে আসতেই অরণ্যে নেমে এল নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। ডাইনিং হল থেকে মাঝে মধ্যে কানে আসতে থাকে কিছু টুকরো কথাবার্তা, এতদ্ব্যতীত আর কোনও শব্দ নেই কোথাও। ঘরের বাইরে বেরোলে মালুম হচ্ছে হাড়-কাঁপানো ঠান্ডা পড়েছে, কাল সকালে আকাশ পরিষ্কার থাকলে আমাদের ডেকে দেওয়া হবে ভোর-রাত্রে, সূর্যোদয় দেখতে যেতে হবে ওয়াচ টাওয়ারে। তবে কুয়াশার পর্দা মনে হচ্ছে সরেনি এখনও, আকাশে তাকালে নজরে আসছেনা কোনও নক্ষত্রের আলো, সুতরাং মনে হচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা এবার অধরাই রয়ে যাবে আমাদের কাছে। কুয়াশার পর্দার ওপারে তার উপস্থিতিকে শুধু কল্পনাই করে নিতে হবে এবারের মত। রাত্রে কটেজের ম্যানেজার জোরালো আলো ফেলে দেখালেন পাহাড়ের গায়ে কোনও বন্যপ্রাণীর উপস্থিতি, তার চোখদুটি জ্বলছে। গ্রামে ম্যানেজারের নিজ গৃহের হোম-স্টেতেও রয়েছেন বেশ কিছু অতিথি। তাদের জন্য আয়োজন করা হয়েছে বন-ফায়ারের, ওপরে পাহাড়ের গায়ে চোখে পড়ছে সেই আগুনের আলো, রাত্রির নৈঃশব্দ্য ভেঙে মাঝে-মাঝে কানে আসছে উচ্চকিত হাসির আওয়াজ। কটেজের কর্মীরা রান্না সেরে টেবিলে খাবার সাজিয়ে রেখে যে যার মত গ্রামে ফিরে গেলেন রাত্রি আটটার মধ্যেই, ডাইনিং

হলের চাবি থাকল আমাদের কাছেই, খেয়ে-দেয়ে আমরাই তালা লাগিয়ে দেব, সেইরকমই কথা হল।

সকালে উঠে দেখলাম আমাদের আশঙ্কাকে সত্যি করে কুয়াশার চাদর তখনও নিজের জায়গা ছাড়েনি একটুও। অতএব, সূর্যোদয় আর দেখা হলনা এই যাত্রা। প্রাতরাশ শেষ করে স্থানীয় একটি কিশোরকে পথপ্রদর্শক করে বেরিয়ে পড়া গেল পাইনের জঙ্গলের রাস্তা ধরে ছোট্ট একটু জাঙ্গল-ট্রেকে। মিনিট পনের-কুড়ি হাঁটার পরে দেখা মিলল খুবই ছোট্ট এক জলাশয়ের - নাম কালিপোখরি। মনে হল স্থানীয় মানুষ-জনের কাছে জলাশয়টি বেশ পবিত্র, শিবরাত্রির পূজার চিহ্ন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে চারপাশে। কালিপোখরির শোভা খুব একটা আহামরি গোছের না হলেও, জলাশয়টির একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এখানে দেখা মেলে একটি বিপন্ন, অতি-বিরল প্রজাতির উভচর প্রাণীর, যার নাম হিমালয়ান নিউট বা সালামান্ডার। জলাশয়ের ধারে কিছুটা সময় কাটিয়ে আবার বনপথ ধরে ফিরে আসা গেল কটেজে। দেখতে দেখতে ফেরার সময়ও এগিয়ে এল। ফেরার পথে গাড়িতে সঙ্গী হল এক স্থানীয় তরুণী, সে তার শিশুকন্যাটিকে নিয়ে যাবে সেই আট কিমি দূরের সোনাদায়, যেখানে শিশুটি তার দাদু-দিদার কাছে থেকে একটি স্কুলে পড়ে। তরুণীটি কথাবার্তায় যথেষ্ট সাবলীল এবং সপ্রতিভ, ইংরেজি শব্দের ব্যবহার শুনে মনে হল সে নেহাত অল্পশিক্ষিত নয়। রাস্তার করুণ অবস্থার দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করায় সে জানাল যে ব্যাপারটা তাদের জন্যেও বেশ অসুবিধাজনক, সামান্য কাজে শহরে যেতে হলেও ষোল কিমি হাঁটতে হয়। রাস্তার অবস্থা ভালো হলে আরও বেশি পর্যটক আসবে, স্থানীয় মানুষ যাদের জীবিকা পর্যটন-নির্ভর, তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে, আমাদের এই কথার জবাবে তরুণীটি জানালেন - "লেকিন তব তো হামারা চটকপুর অউর এক দার্জিলিং বন জায়েগা।" গ্রামের এরকম একটা সম্ভাব্য পরিণতি তার পক্ষে যে খুব একটা আনন্দদায়ক হবে, তার কথা শুনে মনে হলনা। পর্যটনের পরিকাঠামো তৈরি করা ও বিকাশ ঘটানো কতখানি বাঞ্ছনীয়, সেই প্রসঙ্গে ওই পাহাড়ি তরুণীর বক্তব্য কিন্তু একেবারে ফেলে দেওয়ার মত নয় বলেই মনে হয়েছে। সুতরাং, পর্যটনের প্লাবনে চটকপুর যেন তার নিজস্বতা হারিয়ে না ফেলে ধরে রাখতে সক্ষম হয় তার আদিম ও নির্জন প্রাকৃতিক পরিবেশ, মনে সেই আশা রেখেই এবারের মতো বিদায় জানানো গেল চটকপুরকে।

~ *চটকপুরের আরও ছবি* ~

এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা এবং পরবর্তী সময়ে কর্মজীবন কেটেছে ভারতের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত বিমান সংস্থায়। অবসরজীবনে সময় কাটে বেহালা বাজিয়ে, নানান ধরনের গান-বাজনা শুনে, বই পড়ে, ফেসবুকে এবং সুযোগ পেলে একটু-আধটু বেড়িয়ে। লেখালেখির জগতে এটাই প্রথম পদক্ষেপ।

অরণ্যের দিনরাত্রি ও আমাডুবি

অভিজিৎ কুমার চ্যাটার্জী

ধলভূমগড়কে ডানহাতে রেখে, সুমিত্র গাড়ি ছোটাল রাউতাড়া রোড ধরে। কলকাতা থেকে প্রায় আড়াইশো কিলোমিটার চলে এসেছি। ছোট ছোট জনপদ, কোপাই নদীর একটি শাখা, পার হয়ে পৌঁছলাম সুন্দরদিহ। আমাদের গন্তব্যস্থল আমাডুবি। অবাক হয়ে দেখলাম রাস্তাটা শেষ হয়ে গেছে। অমিত বলে উঠল, 'গুরু, এ তো আমি কবির কল্পনা, ছবিতে দেখছি।' ২০১১ সাল থেকে শুরু হয় এই গ্রামীণ পর্যটনের পথ চলা। পাথুরে রুক্ষ ভূমিকে ঘাসের আর গাছের ছায়ায় গড়ে তোলা মোটেই সহজ কাজ ছিল না। টাটানগর থেকে ৬৫ কি. মি. দূরে আমাডুবি -- প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় পায়াৎকার (Pyatkar) শিল্পীদের পুনর্বাস - সে এক দীর্ঘ সংগ্রাম।

সাঁওতালি স্থাপত্যে তৈরি কটেজ আর সবুজের চাতাল মনটাকে মাতাল করে তুলল।

বাংলা ঝাড়খন্ড বর্ডারে, ধলভূমগড় থেকে মাত্র ৪.৫ কি মি দূরে, আদিবাসী অধ্যুষিত ছোট্ট একটি গ্রাম, নাম তার 'আমাডুবি।' পায়াৎকার শিল্পীদের গ্রাম। মাত্র পঁয়তাল্লিশটি পরিবার, যারা এই বিশেষ সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত, এছাড়া গ্রামে আছে আরও ঊনসত্তরটি সাঁওতালি আদিবাসী পরিবার। অসাধারণ তাদের শিল্প প্রতিভা। চোখ ফেরানো যায় না তাদের শিল্পসত্ত্বাকে অনুভব করলে। গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়ি, এক একটা শিল্প মন্দির। সমগ্র গ্রামটিতে অসাধারণ প্রতিভাবান মানুষদের বাস, যেন জীবন্ত উপন্যাসের প্রেক্ষাপট।

আলাপ হল পায়াৎকার শিল্পী অনিল চিত্রকর মহাশয়ের সঙ্গে। আলাপচারিতায় পেয়ে গেলাম কিছু তথ্য - গান, সংকীর্তন ও পায়াৎকার শিল্পকলা চর্চাবিষয়ক। ঘাটশিলার রাজাবাহাদুর রামচন্দ্রধর পায়াৎকার শিল্পীদের আমাডুবিতে জমি দান করেন। সেই থেকে বংশপরম্পরায় এই শিল্পকলা চলে আসছে। 'দাতা কর্ণ,' 'নরমেধ যজ্ঞ' এই ছিল পূর্বতন পায়াৎকার শিল্পীদের বিষয়। কাগজের ওপর হাতে তৈরি রং (মূলত তৈরি গাছের ছাল ও স্থানীয় পাথর থেকে) দিয়ে আঁকা হয়। তুলি তৈরি করা হয় ছাগলের লোম ও বাঁশের কাঠি দিয়ে। তারপর সেই কাগজ কাপড়ের ওপর সাঁটা হয়। ফলে একটা শক্তপোক্ত রূপ পায় ছবিগুলি। শেষে দেওয়া হয় নিম গাছ থেকে তৈরি একধরণের আঠা, যাতে পোকা না লাগে। 'করম পর্ব' (ভাদ্র মাসে একাদশী তিথিতে হয়), 'মনসা পর্ব' এরকম বিভিন্ন হিন্দু উৎসবের ছবিও স্থান পেয়েছে এই শিল্পকলায়। পর্যটকরা কিনতে চাইলে পেয়েও যাবেন দাম ৩০০-৫০০ টাকার মধ্যে বিভিন্ন মাপের এই ছবিগুলি। কিন্তু এই শিল্পকলা এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে যেতে চলেছে সঠিক পৃষ্ঠপোষকতা আর বিক্রির বাজারের অভাবে। বর্তমান প্রজন্ম কিন্তু মুখ ফিরিয়ে নিতে শুরু করেছে। এই সমস্যা থেকে কী করে বেঁচে বেরিয়ে আস্তে পারবে প্রাচীন এই শিল্পকলা কেউ জানে না। রামায়ণ মহাভারতের বিভিন্ন মুহূর্ত ও নিজেদের জীবনযাত্রা নিয়ে পায়াৎকার শিল্পীদের হাতের কাজ দেখতে দেখতে মনে মনে কুর্নিশ জানালাম! দারিদ্র্য যাঁদের থামাতে পারেনি। মনে মনে বললাম, 'রুসিকা সঙ্গেকো' - সাঁওতালি ভাষায় 'রুসিকা' কথার অর্থ শিল্পী আর 'সঙ্গেকো' কথার অর্থ একত্রে বাস, সত্যিই যেন শিল্পীদের বাস।

কটেজের বারান্দায় এসে বসলাম, এমন সময় দেখি সুমিত্র আর অমিতের পায়ের কাছে বোতল - আরে এতো মহুয়া! শালের জঙ্গলে এসেছি, মহুয়া তো পান করব-ই।

কোথায় যেন পড়েছিলাম, কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় বলতেন - আমি মাটি তে পা ঠুকলে মাটি ফুঁড়ে মদের ফোয়ারা উঠবে। ওদের দেখে হঠাৎ কথাটা মনে পরে গেল।

শাল মহুয়ার জঙ্গল, লাল মাটি আর নুড়ি ভরা রাস্তায় গ্রাম - আট দশটা কাঁচা বাড়ি। সাঁওতালি পরিবারগুল নিজেদের ব্যস্ত রাখে বাহাশারহুল দাসইসরফা কতরকমের নাচে। এটাই ওদের আনন্দের বহিঃপ্রকাশ। সাঁওতালি ভাষায় নাচকে বলে 'এনেচ' এবং 'তিরিও ওরঙ্গ' মানে বাঁশি বাজানো আর গান কে বলে 'সেরেং'। সামিল হলাম আমরাও। মুগ্ধ চোখে দেখছিলাম মানুষের আদিম সৌন্দর্য। পরিষ্কার করে নিকানো বাড়ির দোরগোড়ায় একটি ছাগল চুপ করে বসে আছে। পায়রাগুলোও এই দুপুরে চুপচাপ -- উড়তেই ভুলে গেছে বোধহয়। দারিদ্র্যের প্রকৃত স্বরূপ বোঝা আমাদের পক্ষে সত্যিই অসম্ভব। জুন মাসে রজঃস্বলা উৎসবে গ্রামের মেয়েরা তৈরি করে 'জিল পিঠে', শুকনো শালপাতায় পরিবেশন করা হয়।

বেহুরা, কারিয়াকাটা গ্রামে ঘুরতে ঘুরতে মনে হচ্ছিল এ যেন চোখকে আরাম দেওয়া প্রকৃতি - শাল পিয়ালের বন, সাঁওতালি নাচ গান, মাদলের বোল। খুব দুঃখ হচ্ছিল - ইসস! যদি বিখ্যাত কবি গুরু রামদাস মাঝির দেখা পেতাম। আলাপ হল তাঁরই নাতির নাতি রাহুল টুডুর সঙ্গে। ঘুরে বেড়ালাম তাঁদের তৈরি আম বাগানে, কোনও বাধানিষেধ নেই আম নেওয়ার। ব্রিটিশ জমানায় গুরু রামদাস মাঝি ছিলেন গ্রাম প্রধান, ব্রিটিশদের রাজস্ব দেওয়ার জন্য তিনি তৈরি করেন এই আম বাগান, বাঁচিয়ে দেন গ্রামের অধিবাসীদের ব্রিটিশদের রাজস্ব আদায়ের অত্যাচারের হাত থেকে। তাঁর লেখা 'খেরওয়াল বংশ ধরম পুঁথি'তে একটু চোখ বোলালাম।

মেয়েদের মাথায় লাল ফুল, পুরুষের পিঠে তিরধনুক, মাথার ওপর আকাশ। বিস্তীর্ণ এই মালভূমি অঞ্চলটা ভীষণ রুক্ষ, সাঁওতালি পরিবারগুলির কাছে ঠিকঠাক খাবার বলতে প্রায় কিছুই নেই। জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এরা জমানো ধান দিয়ে কোনওরকমে চালিয়ে নেয়। তারপর শুরু হয় বেঁচে থাকার যুদ্ধ। বৃষ্টি যদি না আসে, যদি খরা হয়, এপ্রিল থেকে শুরু হয় না খেয়ে থাকা, পুরুষদের যেটুকু বা জোটে মেয়েদের প্রায় জোটেই না। এখানে দাঁড়িয়ে নিজেকে বড় বেমানান লাগছিল।

শাল, মহুয়ার জঙ্গল আর তার মধ্যে ফুটে থাকা পলাশ, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া। একটা বাড়ির মধ্যে একজন মাদল বাজাচ্ছে, আর একজন নাচছে। গান ধরেছে, 'পথের মাঝে বৃষ্টি আসিল, বন্ধু আমার বাঁধা পড়িল।' কানে ভেসে আসে মান্ডের, নাগারা আর সিঙ্গা-র শব্দ - সাঁওতাল আর মুন্ডারা তো ভীষণ নাচ আর গান ভালবাসে।

অরণ্যে নিজের মুখোমুখি হয়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মতো জিজ্ঞাসা করে উঠি,'মানুষ যেমন কাঁদে, আচ্ছা জঙ্গলের পশুপাখীও কি কাঁদে?' আসলে জঞ্জলের রিমঝিম করা স্তব্ধতা আর তার মধ্যে আমরা! সুনীলের ভাষায় বলে উঠি আমরা যেন 'মুখচোরা বেশ্যা'।

গরুর গাড়িতে করে আমাডুবি ঘুরতে ঘুরতে নিজেদেরকে 'অরণ্যের দিনরাত্রি'-র চরিত্র মনে হচ্ছিল। সেই বোহেমিয়ানিজম তাড়া করে ফিরছিল আমাদের। আমরা যেন 'হেমন্তের অরণ্যের পোস্টম্যান'। চিৎকার করে বলে উঠলাম,'বৃষ্টি নামল যখন, আমি উঠোন পারে একা'।

রাত নেমে এল। নদীর ধারে এসে বসে থাকলাম কিছুক্ষণ - আকাশ নিকষ কালো। দূরে, বহু দূর থেকে কানে ভেসে এল দ্রিদিম দ্রিদিম শব্দ - মাদল কিংবা খোল; কিন্তু এমনই আধোজাগা, গম্ভীর সেই শব্দ যে রীতিমত রহস্যময় মনে হয়। আমরা চুপ করে শুনি...

অভিজিৎ কুমার চ্যাটার্জী পেশাগত ভাবে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার। আর নেশা ভ্রমণ। নেশার তাগিদে ঘুরে বেড়িয়ে নির্মাণ করেন পর্যটনকেন্দ্রগুলি নিয়ে বিভিন্ন ট্রাভেল ডকুমেন্টারি।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly , please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory .

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • W eb Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

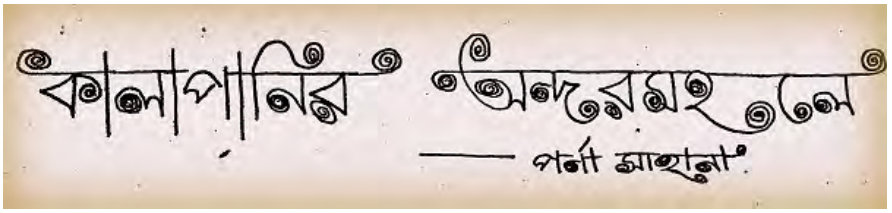

~ আন্দামানের তথ্য ~ আন্দামানের আরও ছবি ~

~ আগের পর্ব পড়ুন এখানে ~

~ শেষ পর্ব ~

৪.২.২০১৭ :

বেড়াতে এলে এই একটা মুশকিল, কোনওদিন সকালে জমিয়ে ঘুম হয়না। রোজই বেরোনোর তাড়া। ঘুম চোখে উঠে তড়িঘড়ি স্নান, গোগ্রাসে ব্রেকফাস্ট সারা এবং কাঁধে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়া। আজ আমাদের গন্তব্য নীল আইল্যান্ড। এবং আবারও Makruzz-এর ফেরি। নির্ধারিত সময়ের থেকে সে এল একটু দেরিতেই। তবে এবার আর অভিষেকের কোনও অসুবিধা হল না দেখলাম। নীল-এর জেটিতেও পুগালের পরিচিত একটি ছেলে, রাজার থাকার কথা। জাহাজ থেকে নেমে দেখি রঙের জাদুকরের ভেলকি এখানেও পিছু ছাড়েনি। ছাড়ার কথাও নয় অবশ্য। কিন্তু তাও, বারবার কিরকম অবাক বিস্ময় বোধ জাগছে মনে। এত রূপ যেন অবিশ্বাস্যই লাগছে কখনও কখনও। এখানে জলের নীল যেন আরও স্বচ্ছ, আরও উজ্জ্বল। হোটেলে নিয়ে যাওয়ার পথেই রাজা আমাদের নিয়ে গেল ন্যাচারাল ব্রিজ দেখাতে। এটি আসলে একটি বিশালাকৃতির মৃত কোরাল, তোরণের মতো চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জায়গাটি খুব শান্ত ও মনোরম। রোদ প্রখর হলেও একটু ছায়া দেখে বসে থাকতে যে কী ভালো লাগছে! জলে রঙের এমনই মোহ, চোখ ফেরাতেই ইচ্ছে করে না। ঘন্টার পর ঘন্টা চোখের পলক না ফেলে তার রূপসুধা পান করা যায়। ঢেউ বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে এগোনোর চেষ্টা করলেও বেশ কয়েকবার ব্যর্থ হয়েছি, জুতোর ভেতর জল ঢুকে ভিজে গেছে। ফিরে গিয়েই শুকোতে দিতে হবে।

নীল আইল্যান্ডটি বিস্তৃতিতে খুবই স্বল্প পরিসর। দ্বীপের প্রধান রাস্তাটি সর্বসাকুল্যে ৮ কি.মি. লম্বা। বাইক ভাড়া পাওয়া যায় এখানে, ঘোরার জন্যে যা অত্যন্ত সুবিধাজনক। এখনই ঠিক করে ফেলেছি, এর পরের বার যখন আসবো, নীলের জন্যে বরাদ্দ হবে অন্তত দু দিন এবং পায়ে হেঁটে দ্বীপটা চষে বেড়াব যতটা পারি। এখানেও বাঙালি আধিপত্য এত বেশি যে আমাদের হোটেলের নামটাও (অমূল্য রেসিডেন্সি) বাংলায় লেখা। রাজা নিজে তামিল হলেও সারাদিন আমাদের সঙ্গে বাংলাতেই কথা বলে গেল সাবলীলভাবে। হোটেলের বাসিন্দারাও দেখলাম সবাই বাঙালি। তবে শুধু আমরাই কোনও ট্যুর অপারেটরের সঙ্গে আসিনি। তাই বেশ নিশ্চিন্তমনে ঘুরে বেড়াচ্ছি নিজেদের মত করে। কোনও নিয়ম বা সময়ের বাঁধাধরা গন্ডিতে বাধ্য নই।

বিকেলে গেলাম লক্ষ্মণপুর বিচ। নীল আইল্যান্ড-এর জায়গাগুলো রামায়ণের চরিত্রের নামে নামাঙ্কিত। রামনগর, সীতাপুর, লক্ষ্মণপুর ও ভরতপুর। আমি ভেবেছিলাম এখানেও বিদেশি পর্যটকদের রমরমা দেখব, হ্যাভলকের মত, কিন্তু দেখলাম বাঙালিদেরই আধিপত্য। আমরা যখন পৌঁছাই, বিচটি নির্জন। অর্থাৎ আবার একাত্ম হওয়ার সময়, আবার সমুদ্র, আকাশ, প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যাওয়ার সময়। অভিষেক তো যথারীতি ক্যামেরা নিয়ে ব্যস্ত, আমি শুধু আমার একলা মন ভাগ করে নিই জল-বালি-আকাশের সঙ্গেই।

আরও একবার সূর্যাস্তের পালা। আবারও সেই মায়াবী আলোয় জল আর আকাশের মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়ার শুভক্ষণ এসে আপ্লুত করছে। এই সময় শুধু হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে, নিজের থেকেও অনেক দূরে। সব মনখারাপ মিলিয়ে যায় ওই দিগন্ত রেখায়, যেখানে আকাশ হারিয়ে গেছে সমুদ্রের বুকে... নাকি সমুদ্র আকাশে?

অনেকখানি ভালোলাগা নিয়ে ফেরার পর ঠিক করলাম কাছাকাছি স্থানীয় বাজারে একটু ঘুরে দেখব। তা ঘুরতে এসে দেখি বাজার শুরু হওয়ার পর দু'পা হাঁটলেই বাজার শেষ! কী আর করা, আবার আমরা হোটেলমুখো। বলতে ভুলে গেছি, লক্ষ্মণপুর বিচ থেকে ফেরার পথে একজনের কাছে তন্দুরি কাঁকড়া অর্ডার করে এসেছি, সে হোটেলেই পৌঁছে দেবে বলেছে। প্রায় সাড়ে আটটা নাগাদ এলো সেটা। খুলে দেখি পরিমাণে প্রচুর! যদিও আমি কম করেই অর্ডার করেছিলাম, তাও যেটা দিয়েছে সেটা আমার একার জন্যে অনেক! অভিষেক তো চেখেও দেখবে না, সব আমাকেই গলাধ:করণ করতে হবে। খেতে কিন্তু দারুণ। প্রায় এক ঘন্টা ধরে কাঁকড়ার দাঁড়া-টাঁড়া নিয়ে কসরত করে যুদ্ধে জয় লাভ করলাম। আজও তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে হবে, কাল ভোরে উঠে সানরাইজ দেখতে যাব।

৫.২.২০১৭ :

অন্ধকার থাকতে থাকতেই উঠে পড়েছি। কোনরকমে ঘুমচোখে জামাটা পাল্টে নিয়েই বেরোব সূর্যোদয় দেখতে। দিল্লিতে তো এই সুবর্ণ সুযোগ বা সময় কোনটাই হয়না। তাই এখানে এসে একটি সুযোগও হাতছাড়া করতে চাই না। তৈরি হয়ে রাজাকে ফোন করে ডাকতেই ও চলে এল মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই। কাছেই বাড়ি ওর। সীতাপুর বিচে যখন পৌঁছলাম, বেশ অন্ধকার। আমরা ছাড়াও আরও দু-একজন এসেছে। আস্তে আস্তে আরও কয়েকজন এল। এই সৈকতটিও বেশ ছোট। ধীরে ধীরে পুব আকাশ রাঙাতে শুরু করছে, কেটে যাচ্ছে আঁধারের অন্তরাল। আকাশে অল্পবিস্তর মেঘ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, তাই পুরো পরিবেশটাই হয়ে উঠেছে আরও নাটকীয়। আমরা যেন এই রঙ্গমঞ্চের দর্শক। কোনও এক অদৃশ্য পরিচালক সুনিপুণ দক্ষতার সঙ্গে রচনা করছেন তাঁর নাটকের প্রথম দৃশ্য। সারাদিন নানাভাবে আরও কত কিছুই লেখা হয়ে যাবে!
একটু একটু করে আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে সারা বিশ্বময়, মনটা ততোই কেমন যেন এক অদ্ভুত প্রশান্তিতে ভরে উঠছে। এ জগতে যেন কোনও দু:খ থাকতে পারে না, কষ্ট থাকতে পারে না; সকলের সব মনখারাপ মুছিয়ে দিতে পারে, এ এমনই মায়াবী আলো। কিন্তু নাটকের নায়ক, অর্থাৎ সূর্যের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। তার আলোর ছটায় সবাই ধুয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তিনি এখনও লুকোচুরি খেলছেন মেঘের আড়ালে থেকে। সবাই যখন প্রায় হতাশ হয়ে ফেরার উদ্যোগ নিচ্ছে, ঠিক তখনই, তক্ষুনি হল সেই মিরাকল! একটুকরো মেঘের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলেন তিনি। গ্রহণের পর রাহুর গ্রাস থেকে মুক্ত হয়ে সূর্যের যে হিরের আংটির দ্যুতি ঠিকরে পড়ে, এও ঠিক সেই রকম। একখন্ড হীরক থেকে দ্যুতি ঠিকরে পড়ছে সারা আকাশ জুড়ে। জল, মাটি, আকাশ - সবাই খেলছে তাদের প্রাত্যহিক হোলি, হলুদ, কমলা, লাল আবির নিয়ে। এই মুহূর্তগুলোতে বেঁচে থাকার জন্যে বারবার আসা যায় এই পৃথিবীতে, বারবার ভুলে যাওয়া যায় সকল ক্লেশ।

স্নান আর ব্রেকফাস্ট সেরে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আজকেই পোর্ট ব্লেয়ার ফেরার জাহাজ ধরব আমরা। তবে তার আগে কিছুক্ষণ ভরতপুর বিচে সময় কাটাব। ভরতপুর বিচটা একেবারেই জেটির ধারেই। কাল জেটিতে নেমেই যে ম্যানগ্রোভগুলোকে জলে অর্ধনিমজ্জিত দেখেছিলাম, দেখলাম সেগুলো আজ অনেকটাই উন্মুক্ত, নিশ্চয় ভাঁটা চলছে এখন। অলসভাবে হেঁটে ঘুরে, ছবি তুলে সময় কাটালাম। কিছু টুকটাক কেনাকাটিও করলাম বাড়ির সবার জন্য। জাহাজের সময় এগিয়ে আসছে। এই ছোট্ট দ্বীপটা এই অল্প সময়ের মধ্যে এমন মায়ায় বেঁধে ফেলেছে, ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু উপায় তো নেই। আবার ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি ছাড়া আমার তো আর কিছুই দেওয়ারও নেই তাকে। সে কিন্তু দু'হাত ভরে দিয়ে চলেছে। তার ঝাঁপিতে যত রং ছিল, সব সে যত্ন করে মাখিয়ে দিয়েছে আমার চোখে।
আবার Makruzz। এখানেও সেই হ্যাভলকে আলাপ হওয়া পরিবারটির সঙ্গে দেখা হল। নীলে এসে অনেক জায়গাতেই হয়েছে। আসলে দ্বীপটা অতি ছোট, এখানে দেখা না হওয়াটাই অস্বাভাবিক হত। হয়ত আর কোনদিন এদের সঙ্গে দেখাই হবে না, তবু এই দু-তিন দিনের পরিচয়টাও কতদিন মনে থেকে যাবে। এও এক ধরণের আত্মীয়তা। আর ভ্রমণই পারে বিশ্বের যেকোনও প্রান্তের মানুষদের এই অদৃশ্য আত্মীয়তার সুত্রে বাঁধতে।
পোর্ট ব্লেয়ার পৌঁছতে প্রায় আড়াইটে বেজে গেল। পুগাল অপেক্ষা করছিল জেটিতে। প্যাকড লাঞ্চ কিনে নিয়ে রওনা হলাম চিড়িয়াটাপুর দিকে। শুনেছি এখানে সূর্যাস্ত নাকি দেখার মতো। সানসেট পয়েন্টের থেকে একটু দূরে একটি পার্ক তৈরি করা আছে, সেই পার্কের মধ্যে দিয়ে একটা ছোট ট্রেক রুট আছে মুন্ডা পাহাড়ের দিকে। স্থানীয় লোকজনের বেশ ভিড় দেখলাম এখানে, আজ রবিবার বলে বোধহয়। খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে ওই ট্রেক রুট ধরে হাঁটা শুরু করলাম। ঠিক কোন জায়গাটা মুন্ডা পয়েন্ট, সেটা আমি নিশ্চিত বলতে পারব না। তবে এক জায়গায় এসে বেশ খোলা একটা প্রান্তর, পাশে একটি সুইসাইড পয়েন্ট আছে (আজ অবধি আমি বোধয় এমন কোনও যায়গায় বেড়াতে যাইনি যেখানে এই নামে কোনও জায়গা নেই! কে আসে এত সুন্দর জায়গায় সুইসাইড করতে? এই সৌন্দর্যের মধ্যে কি মৃত্যুর কথা মনে আসে কারো?), সম্ভবতঃ সেটাই মুন্ডা পয়েন্ট। সেখানে এসেই বেশির ভাগ লোকজন থেমে যাচ্ছে, তবে আমরা এগোলাম আরও। আরও এক-দেড় কিলোমিটার এগিয়ে একটি লাইট হাউস আছে, তার পেছনে সমুদ্র দেখা যায়, এবং একজনের মুখে শুনলাম এটি দক্ষিণ আন্দামানের দক্ষিণতম প্রান্ত। জায়গাটি প্রকৃত অর্থেই খুব সুন্দর। এতটা হেঁটে আসা সার্থক মনে হয় এখানে এসে।

নেমে এসে গাড়িতেই গেলাম সানসেট পয়েন্টের দিকে। রাস্তার পাশে খাঁড়ির মত জল, উল্টো দিকে পাহাড়ের কোলেই সূর্য অস্ত যায় এখানে। জলের মধ্যে ইতস্ততঃ কয়েকটা গাছের গুঁড়ি, কয়েকটা পাথর এখানে ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে। আর তাতে জায়গাটার সৌন্দর্য একলাফে বেড়ে গেছে অনেকটা। সূর্য যখন আস্তে আস্তে পাহাড়ের কোলে নামল, জলের মধ্যে তখন যেন কেউ ছড়িয়ে দিল অসংখ্য সোনার কুচি। দূরে একটা দুটো উদাসী নৌকো ভেসে চলেছে। সূর্য যতই নেমে আসছে, জলে ততই লাগে সোহাগের ছোঁয়া। সূর্যোদয় মনে প্রশান্তির ছাপ রেখে গিয়েছিল বলেছিলাম, কিন্তু সূর্যাস্ত প্রতিবারই বয়ে আনে মনখারাপের বার্তা। যে হাত একদিন মুঠো ছেড়ে দিয়েছিল, তার স্পর্শের স্বাদ নতুন করে আচ্ছন্ন করে তোলে। শেষ বেলার পড়ন্ত আলোটা কেমন যেন বিবশ করে তোলে মনকে, যা নেই তাই পাওয়ার আশায়।

৬.২.২০১৭ :

ইংরাজি ক্যালেন্ডারের হিসেবে এই দিনলিপি নতুন তারিখে লিখছি বটে, তবে বাংলামতে এখনও নতুন দিনের শুরু হয়নি। রাত সবে আড়াইটে। এই মাঝরাতে উঠে কী করছি তাই ভাবছেন? আজ আমরা উত্তর আন্দামানের দিগলিপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করব। দূরত্ব প্রায় ৩৬০ কি.মি., সময় লাগে প্রায় দশ ঘন্টা। তার ওপর এই রাস্তায় পড়ে জারোয়া রিজার্ভ, যেটি পেরোতে কনভয়ের নির্ধারিত সময় মেনেই যেতে হবে। সারা দিনে

চারবার কনভয় যায়, তিন ঘন্টা অন্তর। অত দূরের রাস্তা, তাই সকাল ছটার প্রথম কনভয় না ধরলে বেজায় মুশকিলে পড়তে হয়। মুশকিল অবশ্য আর কিছু নয়, শুধু দিগলিপুর পর্যন্ত পৌঁছনো যায় না এক দিনে, মাঝখানে রঙ্গত বা মায়াবন্দরে রাত্রিবাস করে পরদিন দিগলিপুর যেতে হয়। কিন্তু এতে একদিন সময় নষ্ট। তাই আজ আমরা সাড়ে তিনটের সময়ে বেরিয়ে কনভয়ের লাইনে দাঁড়াব। যথাসময় তৈরি হয়ে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে দেখি পুগালও এসে গেছে। মাঝরাতে ঘুম থেকে ওঠা, তার ওপর গাড়িতে ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া। আমাকে আর পায় কে? গাড়িতে উঠেই ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল পাঁচটা নাগাদ, গাড়ি যখন জিরকাটাং চেকপোস্ট পৌঁছেছে। এখান থেকেই কনভয় ছাড়ে। সব গাড়ির নম্বর টুকে রেখে এক এক করে ছাড়া হয়। জারোয়া রিজার্ভের মধ্যে গাড়িগুলোকে কনভয়ের নিয়ম মেনেই যেতে হবে, ওভার টেক করা যাবে না এবং গতির সীমাও ঘন্টায় ৪০ কি.মি.। ছবি তোলাও মানা।
লাইনে আমাদের গাড়ি তিন নম্বরে। ছটার মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটা গাড়ি লাইনে দাঁড়িয়ে গেল। যথারীতি যাত্রীদের পঁচানব্বই শতাংশই বাঙালি। এবং তাদের অধিকাংশের মধ্যেই জারোয়া দেখার অত্যন্ত দৃষ্টিকটু অশ্লীল উৎসাহ। যেন জারোয়ারা মানুষ নয়, ভিনগ্রহ থেকে দিগভ্রান্ত হয়ে চলে আসা কিছু আজব জন্তু। প্রায় দেড় ঘন্টা পর রিজার্ভ থেকে বেরিয়ে যখন মিডল স্ট্রেইট পৌঁছলাম, তখন তো বেশির ভাগ লোকজন প্রচন্ড হতাশ, জারোয়া দেখতে না পাওয়ার জন্যে। তাতে নাকি তাদের এই জার্নিটাই মাটি! অথচ রিজার্ভের ভেতরটা কী সুন্দর! দুধারে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রাস্তা, জঙ্গল কোথাও ঘন, কোথাও বা হালকা হয়ে এসেছে। ঘন জায়গাগুলোতে গাছের এতটাই ভিড় করে আছে যে সূর্যের আলো প্রায় প্রবেশ করতে পারে না। আর যেখানে অপেক্ষাকৃত ফাঁকা, সেখানে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের রশ্মিছটা এসে রাস্তা ধুয়ে দিচ্ছে আলতো আদরে। জঙ্গলের গাছগুলোতে, নতুন পাতায় লেগেছে আসন্ন বসন্তের প্রেমের রং, ঠিক যেন নববধূর সিঁথির সিঁদুরে লাজ। প্রকৃতি তো মুক্তহস্তে আমাদের জন্যে চারদিকে বিছিয়ে রেখেছে তার রূপের সম্ভার। শুধু দেখার চোখটাই দেয়নি সবাইকে। তাই বুঝি কেউ আড়ম্বর খোঁজে, বাহ্যিক বাহুল্যতায়, নকল সাজসজ্জায় রূপ খোঁজে। আর কেউ কেউ খুশি হয়ে বরণ করে নেয় নিরাড়ম্বর প্রেমটুকু, সেটাই হয়ে ওঠে তার অন্তরের ধন। আর জারোয়ারা, তারা তো আমাদের মতই মানুষ। তাদের দেখতে না পেলে আন্দামান আসাই বৃথা - এ তো সেই মানুষ জাতিকে অপমান করার সমতুল্য, মনুষ্যত্বকে অসম্মান করার মাফিক। হোক না তাদের গায়ের রং নিকষ কালো, হোক না মাথার চুল ছোট ছোট ও কোঁকড়ানো, তবু ওরা তো পারে ওদের নিজস্বতা বজায় রাখতে। আমরা তথাকথিত সভ্য মানুষেরা সেটা পেরেছি কই? এখন যদিও জারোয়ারাও খানিক বাইরের জগতের সঙ্গে মিশতে শুরু করেছে, অতটা শত্রুভাব পোষণ করেনা ঝকমকে জামাকাপড় পরা লোকেদের প্রতি। কিন্তু সেন্টিনেলিরা এখনও সভ্য জগতের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়নি। তারা এখনও তাদের মত করে বাঁচে, তাদের স্বতন্ত্রতাকে বাঁচিয়ে রেখে।
মিডল স্ট্রেইট পেরোতে হবে বোটে। যত গাড়ি, বাস যা কিছু যানবাহন ওপারে যাবে, সবই বোটে করেই পেরোবে। পেরিয়ে এসে আবার গাড়িতে চাপা। এরপর আর একবার এরকম বোটে চড়তে হয় কদমতলায়। উত্তর আন্দামানের পথে জায়গাগুলোর নাম একেবারেই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গার নামের মত - কদমতলা, দুর্গাপুর, শিবপুর ইত্যাদি। শুনলাম এদিকে বাঙালিদেরই বসবাস। মাঝে মাঝে দু-একটি চেকপোস্ট, সেখানে নিয়মমাফিক কাজ সেরে আবার চলা। রঙ্গত পৌঁছে বেশ কয়েকটা বিচ ঘুরে নিলাম আবার। আমকুঞ্জ ও মরিচডেরা - দুটো বিচ। এরপর বেতাপুরে একটি ম্যানগ্রোভ ওয়াক। দুধারে ম্যানগ্রোভের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কাঠের পাটাতন দিয়ে তৈরি করা আছে রাস্তা, মাঝে মাঝে বিশ্রামের জন্যে ছাউনি, তাদের আবার নামকরণও হয়েছে আন্দামানের বিভিন্ন পাখিদের নামে। ম্যানগ্রোভেরও কত রকমফের, আর কতই বা তাদের নামের বাহার - হাতিকান, কামান গোলা ইত্যাদি। এই হাঁটা রাস্তা নিয়ে যায় ধানি নাল্লা সৈকতে। এখানে একটি টার্টল হ্যাচারি আছে, কিন্তু সিকিউরিটি গার্ড বা অন্য কর্মী না থাকায় এদিন আর সেখানে কচ্ছপ দেখা হল না। অনেকটা রাস্তা যেতে হবে, তাই বেশি সময় ব্যয় না করে ফিরে গিয়ে বসলাম গাড়িতে। আবার চলা শুরু। বিকেল চারটে নাগাদ দিগলিপুর পৌঁছলাম। তবে আমরা থাকব দিগলিপুর শহর থেকে আরও ২০ কি.মি. দুরে কালিপুরে। এখানে থাকার জায়গা বলতে দুটো। একটি সরকারি গেস্ট হাউস, আর একটি প্রাইভেট। আমাদের আগে থেকে বুকিং ছিল না কোথাওই। প্রথমে প্রাইভেট রিসর্টটিতেই ঢুকলাম। বিশাল জায়গা জুড়ে তৈরি রিসর্টটি। খুব পরিপাটি বাগান, পক্ষীপ্রেমীদের জন্যে জায়গাটি রীতিমত স্বর্গ। এসেই বুঝলাম এখানের জন্যে মাত্র একটি রাত বরাদ্দ রাখা খুব বোকামি হয়েছে। কিন্তু এখন তো আর কিছু করার নেই। এখানে কটেজগুলোও খুব সুন্দর, ছিমছাম, সাজানো। এক অস্ট্রেলিয়ান দম্পতির সঙ্গে আলাপ হল, এখানে আমাদের প্রতিবেশী। ভদ্রলোক কাঁধে একটা বিশাল লম্বা লেন্স সমেত ক্যামেরা আর হাতে একটা "বার্ডস ইন আন্দামান" বই। পাখি খুঁজে আর ছবি তুলে চলেছেন। কোনও একটা পাখি দেখলেই বই খুলে ছবির সঙ্গে মিলিয়ে বার করছেন তার নাম। এদের জীবনটা কী ঈর্ষনীয় লাগে মাঝে মাঝে! কতভাবে জীবনটাকে উপভোগ করা যায় এরা জানে এবং সেই উপায়ও তাদের আছে। আমাদের দেশের লোকেদের হয় ইচ্ছেটাই নেই, ইচ্ছে থাকলেও সাধ্য নেই অনেকের, আবার যাদের দুটিই আছে তাদের অনেকেরই সময় নেই। কর্মক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের ছুটি পাওয়া যায় না এখানে, অথচ বিদেশে বহু লোক আছে যারা ছয় মাস কাজ করেন এবং বাকি ছয় মাস পৃথিবী ঘুরে কাটান।
যাই হোক, যা নেই সেই আলোচনা এখন মুলতুবি থাক। আপাতত যা আছে, সেখানে মনোনিবেশ করি। রিসর্টটিতে অসংখ্য গাছপালা আর আগেই বলেছি নাম জানা-না জানা অসংখ্য পাখি। মালিক ভদ্রলোকটিও খুব আলাপী। অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত বাগানে হেঁটেই কাটিয়ে দিলাম। রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর যাব কচ্ছপের ডিম পাড়া (টার্টল নেস্টিং) দেখতে, কালিপুর বিচে। অবশ্য দেখতে পাওয়াটা পুরোটাই ভাগ্যের হাতে। রোজ তারা আসে না। তাদের আসা নির্ভর করে অনেকগুলো ফ্যাক্টরের উপর। জোয়ারের সময় তারা আসবে, আবার খুব তীব্র জোয়ারে নয়। চাঁদের আলোও বেশি তীব্র হলে আসবেন না ওনারা। আহা, কচ্ছপ বলে কি ওদের কোনও প্রাইভেসি নেই নাকি? রাত্রে বারোটা নাগাদ গেলাম বটে, তবে আমাদের পোড়া কপালে শিকে ছিঁড়ল না। এখন নাকি ভাঁটা এসে গেছে, তার ওপর চাঁদও এখন বেশ জোরালো, অর্থাৎ, তারা এলেন না আজ। কী আর করা, ভগ্ন হৃদয়ের দু:খ নরম বিছানাতেই এলিয়ে দিলাম।

৭.২.২০১৭ :

আজ সকালে বেরোনোর খুব বেশি তাড়া নেই। এখান থেকে আজ চলে যাব যদিও, কিন্তু মাঝে রঙ্গতে রাত কাটাব, তাই একদিনে অতটা বেশি দূরত্ব অতিক্রম করার টেনশন নেই। এদিকে কাল টার্টল নেস্টিং দেখতে না পাওয়ার আফশোস এখনও যায়নি। যাওয়ার পথে রস অ্যান্ড স্মিথ আইল্যান্ড দেখে সে দু:খ অবশ্য কিছুটা ঘুচলো। এই যমজ দ্বীপ মাঝে একটি বালির চর দিয়ে জোড়া। জোয়ারের সময়ে সেই চর জলের নিচে ডুবে যায়, তখন দেখে মনে হবে দুটি সম্পূর্ণ আলাদা দ্বীপ। ভাঁটার সময় জল নেমে গেলে দেখা যায় এদের মাঝের যোগসূত্রখানা। উত্তর আন্দামানে খুব বেশি পর্যটক আসেন না, তাই ভিড় নেই তেমন। দিগলিপুর থেকে নৌকা করে আসতে হয় এখানে।এখান থেকে ফিরে এসে আমরা রঙ্গতের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

পথে মায়াবন্দরে কারমাটাং সৈকতে কাটালাম বেশ অনেকটা সময়। বেশ লম্বা একটি সৈকত। এবং আমরা ছাড়া আর কেউই নেই সেখানে। বেশ প্রাইভেট বিচে সময় কাটাচ্ছি এরকম একটা অনুভূতি হচ্ছে। যেমন ইচ্ছে, যেদিকে ইচ্ছে হাঁটছি, ছবি তুলছি। কেউ দেখারও নেই। এখান থেকে বেরোনোর সময় একজনের কাছে একটি আশার কথা শুনলাম। ধানি নাল্লা বিচ, যেটা আমরা কাল যাওয়ার পথে দেখেছি, সেখানে নাকি এখন কচ্ছপেরা ডিম পাড়তে আসছে। সুতরাং আমরা রাত্রে ওখানে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি। কাল থেকে হতাশ হয়ে পড়া উদ্যমে আবার একটা নতুন জোর পাওয়া গেল। অতএব আবার এগিয়ে চললাম আমরা। প্রথমে ঠিক ছিল আমরা রঙ্গতে গিয়ে থাকব, কিন্তু ধানি নাল্লা আসতে গেলে রঙ্গত থেকে সেটা কিছুটা দূরে হবে। তাই কাছে যে সরকারি গেস্ট হাউস আছে, সেখানে গেলাম। ফাঁকাও পাওয়া গেল ভাগ্যক্রমে। এবার আশায় বুক বেঁধে অপেক্ষা।

রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর রওনা হলাম। আবার সেই ম্যানগ্রোভ ওয়াকের মধ্যে দিয়ে হেঁটে পৌঁছলাম সৈকতে। যে হ্যাচারিটা কাল দেখেছিলাম, তার পাশেই সিকিউরিটি গার্ডের থাকার জন্যে একটি একচালা ঘর রয়েছে। ডাকতে দুজন ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। বেশ সহৃদয় ওঁরা। এখানেও আজ কচ্ছপদের আসার সম্ভাবনা খুব কম। কারণ ওই একই, পূর্ণিমা আসন্ন, তাই চাঁদের আলো বেশ প্রকট। আর এত আলোতে নাকি তারা ডিম পাড়তে আসে না। তবে আমাদের হ্যাচারি দেখাতে নিয়ে গেলেন টর্চ নিয়ে। আর গিয়েই দেখি কি কান্ড! এক রাশ বাচ্চা কচ্ছপ, সদ্য ডিম ফুটে

বেরিয়েছে, হ্যাচারির ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছে। কচ্ছপেরা যখন সমুদ্র তীরে বালিতে ডিম পেড়ে রেখে সমুদ্রে ফিরে যায়, সেই ডিম সংগ্রহ করে এই হ্যাচারিতে এনে বালির মধ্যে গর্ত খুঁড়ে রাখা হয়। একটি একটি গর্তে কতগুলো ডিম কবে রাখা হয়েছে, সেসব লিখে রাখা হয়। মোটামুটি পঁয়তাল্লিশ দিন পর ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়ে আসে। তারপর সেগুলো সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে আসা হয়। আমাদের প্রতি ভাগ্যদেবী কিছুটা হলেও সদয় হয়েছেন, আজই একটি হ্যাচ থেকে বাচ্চা বের করার দিন। ওই দুই ভদ্রলোক মিলে একটি বালতিতে তুলে রাখলেন এক এক করে বাচ্চাগুলো। সংখ্যায় মোট ছিয়াশিটা। তারপর সবাই মিলে গেলাম তাদের সমুদ্রে ছাড়তে। বেশ মজার অভিজ্ঞতা। ছবি তোলার জন্য আলো ফেললেই তারা জলের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে ফিরে আসছে আমাদের দিকে। তারপর আলো নেভালে আবার জলের শব্দে মুখ ঘোরাচ্ছে। আরও কিছুক্ষণ আশায় আশায় ঘুরলাম বিচে, যদি ভুল করেও একটা চলে আসে আজ! কিন্তু না, সেই অসম্ভব আর সম্ভব হলো না। এ তো আর বলিউড সিনেমা নয়, আর আমিও কোনও নায়িকা নই, যে সব আনহোনি কো হোনি করে দিতে পারব! চাঁদের আলোয় ম্যানগ্রোভের মধ্যে দিয়ে হাঁটার অভিজ্ঞতাও বেশ অনেকদিন মনে থাকবে। চারদিক নিস্তব্ধ, শুধু কিছু পোকামাকড়ের ডাক শোনা যাচ্ছে। এতক্ষণে চাঁদের আলোতে চোখও সয়ে গেছে, আলাদা করে আলো লাগছে না পথ দেখতে। সব মিলিয়ে নেস্টিং না দেখতে পাওয়ার দু:খ এখন আর একেবারেই হচ্ছে না দেখলাম।

৮.২.২০১৭ :

বেড়ানোর শেষের মুখে এসে বাড়ির জন্যে একটু হলেও মনখারাপ করে। হয়তো এই বাড়ির প্রতি টানটা আছে বলেই প্রতিবার ঘর ছাড়ার নেশাটা এত মধুর হয়। সবকিছুর শেষে ঘরে ফেরার আশ্বাসটা যেন নোঙ্গর দেয় একটা, আর তাতেই ফের ভেসে যাওয়ার সাহস যোগায় মনে। ন'দিনের বেড়ানোর পর ঘরে ফেরার ইচ্ছেটা একটু একটু করে মনখারাপ করে দিচ্ছে আমাদেরও। তবু চলা তো থামে না, থামালে চলে না। সুতরাং, আবার মাঝরাত থেকে উঠে, ধরাচূড়া পরে ভোর চারটের মধ্যে তৈরি। আজ এখান থেকে পোর্ট ব্লেয়ার ফিরব, পথে বারাটাং আইল্যান্ড ঘুরে। আবার ফিরতি কনভয় ধরতে হবে বলে তাড়াতাড়ি বেরোনো।
উত্তর আন্দামানে এসে একটা জিনিস খুব ভালো লাগল আমার। খুব ছোট জনপদেও শিক্ষাকেন্দ্র এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। বাংলা মাধ্যমের স্কুলও আছে দেখলাম। কদমতলা পৌঁছে দেখি কুয়াশার চাদরে ঢেকে আছে চারপাশ। কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না, তাই বোটও ছাড়ছে না। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর, যখন সূর্যের আলো কুয়াশার সঙ্গে তরবারি খেলায় জয়লাভ করল, আমাদের বোটও নোঙ্গর তুলল।
জল থেকে উঠে লাঞ্চ সেরে হাঁটা দিলাম লাইট হাউসের দিকে। এ আমাদের সবার চেনা, ভারতীয় ২০ টাকার নোটে যে লাইট হাউসটি দেখা যায়, এটা সেটাই। বোটে আসার সময়েই দেখেছি একরাশ নারকেল গাছের মাঝে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে লাল-সাদা বাতিঘর। কিছুটা চড়াই ভেঙে বাতিঘরের সামনে পৌঁছনো তো গেল, কিন্তু ওপরে ওঠার অনুমতি মিলল না। অগত্যা উল্টো পথে ফিরে চলা।
ফেরার পথে আবার আর এক প্রস্থ জলের ঝাপটা খেতে খেতে এলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর যাওয়া হল ফিনিক্স বে জেটি, সেখান থেকে আবার যাব রস আইল্যান্ড, লাইট এন্ড সাউন্ড শো দেখতে। সব আন্দামান ভ্রমণার্থীদের জন্যে আমার অনুরোধ, এটি দেখার সুযোগ হাতছাড়া করবেন না। বেশির ভাগ ট্যুর অর্গানাইজারদের ভ্রমণসূচীতে এটি থাকে না। কিন্তু এটি আমার দেখা সেরা আলোক-ধ্বনি প্রদর্শনী। দ্বীপের ইতিহাস অত্যন্ত সুচারুতার সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে। সঙ্গে বাড়তি পাওনা গুলজার সাহেবের লেখনী আর শাবানা আজমির অনন্য বাচনভঙ্গি। দুধনাথ তেওয়ারির বিশ্বাসঘাতকতা, গ্রেট আন্দামানিজদের বিদ্রোহ, দ্বীপের প্রাচুর্যের দিন, সেখান থেকে গরিমা অবলুপ্তি - সব সুদক্ষভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই উপস্থাপনাটিতে। কখন যে নিজেই হারিয়ে যাই সেই দেড়শ বছর পেছনে, কখন যে সংগ্রামের আগুন আমার বুকের ভেতরেও জ্বলে ওঠে, কখন যে সব বীর শহিদের আত্মত্যাগের মহানতা চোখ ঝাপসা করে দেয়! আর এই সব কিছুর সাক্ষী থেকে যায় আকাশের একফালি চাঁদ, তার সঙ্গিনী দুই উজ্জ্বল তারাকে নিয়ে।

বারাটাং-এ একটি মাড ভলকানো আছে। এটি সম্ভবতঃ ভারতের একমাত্র মাড ভলকানো। মাটির ভেতর থেকে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ক্রমাগত কাদা নি:সৃত হয়ে চলেছে লাভার মত। ওখান থেকে ফিরে জলখাবারের পর্বটা মিটিয়ে নিলাম। তারপর আবার নৌকো করে গেলাম লাইমস্টোন কেভ দেখতে। এই বারাটাং-এ অনেক পর্যটক আসেন পোর্ট ব্লেয়ার থেকে। যারা নর্থ আন্দামান অবধি যায় না, তারা এখান পর্যন্ত এসে এই মাড ভলকানো আর লাইমস্টোন কেভ দেখে আবার ফিরে যান পরের কনভয়ে। লাইমস্টোন কেভ যাওয়ার পথটি ভারী মনোরম। ম্যানগ্রোভের মধ্যে দিয়ে যাওয়া। তারপর বেশ কিছুটা হেঁটে পৌঁছনো হয় গুহামুখে। স্ট্যালাকটাইট আর স্ট্যালাগমাইটের অপূর্ব কারুকার্য এখানে। এখানেও সেই বিভিন্ন পরিচিত আকৃতি খোঁজার খেলা চলল কিছুক্ষণ, কোনটা পদ্মফুল, আবার কোনটা হাতির মাথা। যদিও গাইড বেশিরভাগই কোন দেব-দেবীর আকৃতি দিয়ে বর্ণনা করে, কিন্তু নিজের মত করে নিজের মনের ভাবনাকে ডানা মেলে উড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ তো আমার নিজের হাতেই, থুড়ি, নিজের চোখেই।
ফিরে এসে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা পরবর্তী কনভয়ের জন্যে। পুগাল গাড়ি লাইনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে সময়মত। নিশ্চিন্ত মনে ছাউনিতে বসে বিশ্রাম করতে করতে, এবং বেশিরভাগ যাত্রীদের মুখে অত্যন্ত অশোভনভাবে জারোয়া না দেখতে পাওয়ার আফশোস শুনতে শুনতে সময়টা কেটে গেল। কেউ কেউ তো আবার পথে যে দ্বীপবাসীকেই দেখেছে, তাদের গাত্রবর্ণের গাঢ়ত্বের সঙ্গে জারোয়া হওয়া বা না হওয়ার সম্ভাবনা যাচাই করতে বেশ মাথা ঘামাচ্ছে দেখলাম। সৌভাগ্যবশত: বিরক্তি চরমসীমায় পৌঁছনোর আগেই কনভয়ের টাইম হল।
জারোয়া রিজার্ভের রাস্তাটা এই ভরদুপুরেও অত্যন্ত মনোরম রয়েছে। গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে সূর্যের আলোর লুকোচুরি খেলা এখনও অব্যাহত রয়েছে, যাওয়ার দিন যেমন দেখেছিলাম। নতুন পাতাগুলোতে বসন্তের রং কি আজ আর একটু বেশি করে লেগেছে? গাছগাছালির মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় এক অদ্ভুত সুন্দর গন্ধে মনটা মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। পেট্রল-ডিজেলের গন্ধে অভ্যস্ত নাকে এই গন্ধই যেন সঞ্জীবনী সুধার মত কাজ

করে।

ফিরতে ফিরতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল। পেটে তখন ছুঁচোদের ডন-বৈঠক চলছে। হোটেলে ফিরে কিছু খাবার পেটে দিতে তবে যেন প্রাণ ফিরে পেলাম। সন্ধ্যেবেলা আজ আর বিশেষ কিছু করার নেই, অত:পর বিছানার নরম গদিতেই সঁপে দিলাম নিজেকে।

৯.২.২০১৭ :

আজ আমাদের আন্দামান ভ্রমণের শেষ পর্ব। পোর্ট ব্লেয়ারের স্থানীয় জায়গাগুলো কিছু কিছু ঘুরব আজ। সকালে প্রথমেই গেলাম চ্যাথাম শ মিল। ১৮৮৩ সালে স্থাপিত এই করাত কল আজ রীতিমত ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাকশন। গাছের গুঁড়ি থেকে কাঠ কেটে তাকে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে ব্যবহারোপযোগী করে তোলা হয়। আন্দামানের বিখ্যাত প্যাডক কাঠের জন্যে এই কারখানায় একটি সম্পূর্ণ আলাদা সেকশন আছে। পুরো কারখানাটা ঘুরে দেখতে মন্দ লাগে না। একটি প্রদর্শনী তথা বিক্রয়কক্ষও আছে, রীতিমত নজরকাড়া বেশ কিছু কাজ দেখা যায় সেখানে।

এখান থেকে কাছেই চ্যাথাম হোয়ার্ফ জেটি। এই জেটি থেকে বোটে করে যাব বাম্বুফ্ল্যাট। মাউন্ট হ্যারিয়েট, আন্দামানের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্থান। প্রথম স্থানাধিকারী স্যাডেল পিক রয়েছে দিগলিপুরে। সেখানেও ট্রেক হয়, কিন্তু বেশ সময়সাপেক্ষ, তাই করতে পারিনি। মাউন্ট হ্যারিয়েটে একটি ন্যাশনাল পার্ক আছে আন্দামান প্রশাসনের। জায়গাটা অত্যন্ত শান্ত, খুব বেশি লোকজনও নেই দেখলাম। জাতীয় উদ্যানের মধ্য দিয়ে হাঁটার সময় কত রকমের পাখির ডাক-ই যে শোনা যায়! ভেতরে একটি রেস্ট হাউসও আছে দেখলাম। এত লোভনীয় যে অনায়াসে সেটা যে কারোর bucket list-এ চলে আসবে। দুটি ভিউ পয়েন্ট তৈরি করা আছে ভেতরে, যেখান থেকে আবহাওয়া পরিষ্কার থাকলে বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন দ্বীপ দেখা যায়। কোনও দিকে নীল, কোনও দিকে নর্থ বে। আমরা ভারতীয় কুড়ি টাকার নোটে নর্থ বে লাইট হাউসের যে ছবিটা দেখি, সেটি এখান থেকে তোলা। কালাপাথর ট্রেক বলে একটি ট্রেক রুট আছে এর ভেতর দিয়ে। সেই সুযোগ কি ছাড়া যায় নাকি? প্রায় ২ কি.মি. লম্বা রাস্তা। যদিও কালাপাথরের বিশেষত্বটা যে ঠিক কি, সেটা বুঝে উঠতে পারিনি সেদিন। পরে ফিরে এসে উইকিপিডিয়াতে পড়লাম, ওখান থেকে বন্দীদের গিরিখাতে ঠেলে মেরে ফেলা হত। পায়ের নিচে শুকনো পাতার খসখস শব্দ আর পাখির ডাক ছাড়া অন্য আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায় না। পক্ষীপ্রেমীদের এবং বিশাল বিশাল লেন্স সহ DSLR-ধারীদের জন্যে এই জায়গা রীতিমত স্বর্গ।

মাউন্ট হ্যারিয়েট থেকে ফিরে এসে মেরিন মিউজিয়াম আর অ্যান্থ্রোপোলজিকাল মিউজিয়াম দেখা হল। দুটিই অত্যন্ত আকর্ষনীয় সম্ভারে সমৃদ্ধ। মেরিন মিউজিয়ামে বিভিন্ন রকম সামুদ্রিক প্রাণীদের আলাদা আলাদা কক্ষে প্রদর্শন করা রয়েছে। এর মধ্যে শঙ্খ ও প্রবালের সংগ্রহ আমার খুব ভাল লাগল। অ্যান্থ্রোপোলজিকাল মিউজিয়ামে আন্দামানের আদিবাসী, যেমন ওঙ্গে, গ্রেট আন্দামানিজ, সেন্টিনেলিজ, জারোয়া প্রমুখের জীবনযাপন পদ্ধতি, ব্যবহার্য সামগ্রী ইত্যাদির নমুনা দেখা যায়।

ফেরার পথে পুগাল আমাদের নিয়ে গেল জগার্স পার্ক। এখান থেকে এয়ারপোর্টের রানওয়ে দেখা যায়। জায়গাটা অপ্রত্যাশিরভাবে সুন্দর। ঠিক বিকেল ফুরিয়ে আসার মুখে, আকাশে হালকা মেঘের মায়াজাল ছিঁড়ে সূর্যের শেষ রশ্মিচ্ছটা ঠিকরে পড়ছে আর সারা আকাশে ছড়িয়ে দিচ্ছে এক অলীক রং। এখানে দাঁড়িয়ে মনটা খারাপ হয়ে এলো। আর মাত্র কয়েকটা ঘন্টা, তারপর ছেড়ে চলে যাব এই শহর, এই দ্বীপ। এখানে বিভিন্ন আইল্যান্ডে দেখেছি বোর্ড টাঙানো আছে - "don't take anything except memories"। অন্য কিছু নিয়ে যাওয়ার তো সুযোগই নেই আমার কাছে, স্মৃতিতেই ভরে গেছে প্রাণ। মনের একটা আলাদা প্রকোষ্ঠে যত্ন করে জমানো আছে সব।

১০.২.২০১৭ :

অবশেষে শেষের দিন সমাগত। বাড়ির জন্যে টান অনুভব করছিলাম দুদিন আগে, অথচ আজই আবার এই জায়গাটার জন্যে মনটা ভারী হয়ে উঠছে। এই কদিনে জায়গাটা দু'হাত ভরে দিয়েছে শুধু। কত রকমের অভিজ্ঞতা যে হয়েছে এই কদিনে! সমুদ্রের নিচে ডুবেছি, প্রচুর হেঁটেছি, এমনকি ট্রেকও করেছি এখানে এসে। কত রকমের রং যে দেখেছি তা বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই জানি, তাই চেষ্টাও করছি না। হেসেছি, কেঁদেছি, নস্টালজিয়ায় ভুগেছি, এককথায় জীবনটাকে প্রাণভরে বেঁচেছি এই কদিনে। অনেকগুলো মুহূর্ত বন্দী করে নিয়েছি আমার মুঠোফোনে, কিন্তু চোখ যা দেখেছে তার কাছে সেগুলো অতিশয় নগণ্য। আকাশ এবং সমুদ্রকে মিলেমিশে একাকার করে দেওয়া এমন রঙের খেলা আর কি কোথাও হয়? আর কি কোথাও দিগন্তকে এভাবে ধুয়ে দিতে পারে অস্তরাগের ছোঁয়া? মানুষ কি এত সরল হয় আর কোথাও? আন্দামানই প্রথম জায়গা যেখানে এসে, সেখানে থাকাকালীনই আমি দ্বিতীয়বার আসার প্ল্যান করে নিয়ে ফিরছি। আকাশ থেকে যতক্ষণ সম্ভব দেখা যায়, চোখ ভরে দেখে নিচ্ছি এই দ্বীপরাজিকে, মেখে নিচ্ছি তার সবুজ, জড়িয়ে নিচ্ছি তার নীল। ভালো থেকো আন্দামান, উজাড় করে দাও তোমার সব রূপ, আরও আরও মুগ্ধ কর তোমার কাছে ছুটে আসা সকল পর্যটকদের। তারা যে বড়ই পিপাসার্ত, তোমার সৌন্দর্যের অমৃতসুধা পান করিও তাদের। এই লেখা সেই অর্থে ঠিক ভ্রমণকাহিনি নয়। এতে আন্দামানের ইতিহাস বা ভূগোল সম্পর্কে প্রায় কোনও তথ্যই নেই। জায়গাগুলোর বিবরণে আমার আবেগই বোধহয় বেশি প্রকাশ পেয়েছে। আমি তো আসলে ভ্রমণকাহিনির লেখক নই। বা বলা ভালো, লেখকই নই আমি। এটা আমার চোখে দেখা আন্দামান, আমার ভাবনার রঙে রাঙানো আন্দামান। আমার কল্পনার সাজেই সাজিয়েছি তাকে। আমার স্বপ্নই তার অলংকার, আমার অনুভবই তার কপালের আলপনা। আমার ভালবাসার বসনে সে সেজে উঠেছে নববধূর বেশে। বড় যত্নে লালন করব তাকে, বহুদিন... বহু বছর...

~ সমাপ্ত ~

~ *আন্দামানের তথ্য* ~ *আন্দামানের আরও ছবি* ~

পছন্দের বই আর গান পেলে বাকী পৃথিবীকে আলাদা করে দিতে সময় লাগে না পর্ণা সাহানার। প্রিয় অবসর বিনোদন নানারকম রান্না আর হস্তশিল্প। কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রালয়ে কর্মরতা। নিজের হাতে সংসার গোছানোয় বিশেষ যত্নশীল। মাঝে মাঝেই মুক্তির আনন্দে বেরিয়ে পড়া কারণ ছোটবেলা থেকেই পায়ের তলায় সর্ষে।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly , please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory .

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com

© 2011 - AmaderChhuti.com • W eb Design: Madhuwanti Basu

Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

জাঠ রাজাদের রাজধানীতে

অতীন চক্রবর্তী

দীগ শহরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ কবিতার দুটো লাইন মনে এসে গেল –'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি, দেশে দেশে কত না নগর, রাজধানী' – সত্যিই আমাদের অজান্তে কত না জানা নগর এমনকী রাজধানী রয়ে গিয়েছে। 'দীগ'ও এইরকম প্রায় অজানা এক পুরনো রাজধানী। রাজস্থানের বুকে অবস্থিত ছোট্ট শহর 'দীগ' হয়ত আজকের ইতিহাসে অনেকটাই উপেক্ষিত। কিন্তু ১৭শ-১৮শ শতাব্দীতে এই দীগ-ই ছিল জাঠ রাজাদের প্রথম রাজধানী। এখানকার মাটিতে জাঠশক্তির উত্থান তখন আগ্রা-দিল্লির বাদশাদেরও চিন্তা বাড়িয়ে তুলেছিল। এর মাটিতে দাঁড়িয়ে জাঠদের বীরশ্রেষ্ঠ রাজা সূরজমল রুখে দিয়েছিলেন মোগল-মারাঠার মিলিত শক্তিকে। বীর জাঠদের রণহুঙ্কারে পিছিয়ে গিয়েছিল সেই আশি হাজার সেনার মিলিত শক্তি। এমনকি একবার (১০ মে ১৭৫৩ সাল) জাঠেরা দিল্লির কেল্লায় প্রবেশ করে অনেক মূল্যবান সামগ্রী তুলে এনেছিল এই দীগ-এ। জয়ের স্মৃতি হিসেবে সম্পূর্ণ একটি মার্বেল নির্মিত প্রাসাদকেও কয়েক অংশে খুলে দীগ-এ নিয়ে এসেছিল। ১৭৩০ সালে সূরজমলের তৈরি দীগের রাজপ্রাসাদের চারপাশে ঘেরা দুর্গ ছিল দুর্ভেদ্য। বারবার ফিরে গিয়েছে আক্রমনকারীরা সুরক্ষিত দীগের দুর্গের প্রাচীরের বাইরে থেকেই। চারদিকে জলে ঘেরা প্রায় ৭.৮ কি.মি. বৃত্তের পরিধি নিয়ে গড়া প্রশস্ত প্রাচীর এই রাজধানীকে সব রকম আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করেছিল সেদিন। প্রাচীরের গায়ে রয়েছে দশটি প্রবেশদ্বার, রয়েছে শক্তিশালী বৃহৎ আয়তনের বুরুজ - দূরপাল্লার আক্রমণের উপযোগী নানা কামানে সুসজ্জিত। সেইসময় কোনোদিনই বাইরের কোনও শক্তি এসে দীগের সুন্দর মোগল-রাজপুত স্থাপত্যশিল্পে ভরা রাজমহল-প্রাসাদ-স্মৃতিস্তম্ভ বা পুষ্পশোভিত অতুলনীয় সবুজ বাগিচায় সাজানো সুপরিকল্পিত এই দুর্গকে দখল করতে পারেনি। তাইতো সমসাময়িক ঐতিহাসিক বা লেখকেরা সূরজমলকে 'Jat Odysseus' বা 'The Plato of Jat people' নামে উল্লেখ করেছেন।

দীগ-এ এসে প্রথমেই পর্যটকেরা বাইরে থেকেই দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে উপভোগ করে নেয় এই পরিকল্পিত দুর্গকে। আর শ্রদ্ধায় সম্মান জানায় বীরযোদ্ধা জাঠশ্রেষ্ঠ রাজা সূরজমলকে তাঁর এই অবদানের জন্য। মোগল-রাজপুত স্থাপত্যশিল্পের একটি আদর্শ উপমা এখানকার মহল, রাজপ্রাসাদ, হাভেলি, বাগিচা। এগুলির বেশিরভাগই রাজা সূরজমলেরই অবদান। দীগের প্রকৃত স্বর্ণযুগ এসেছিল তাঁরই সময়। একদিকে তিনি যেমন ছিলেন বীর অপরদিকে ছিলেন সুন্দরের পূজারী।

এই প্রাসাদদুর্গে এতভাবে জলকে আমোদ-প্রমোদে বা দুর্গের সুরক্ষার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, যে সাধারণের কাছে এটি 'জলমহল' নামেই বেশি পরিচিত।

দূর থেকে দুর্গের রূপ উপলব্ধি করতে করতে এসে পৌঁছলাম প্যালেস কমপ্লেক্সের সুউচ্চ তোরণ 'সিংহপোল' বা প্রধান প্রবেশদ্বারে - খিলানের নিম্নস্থ পথের গোড়ায়। ওপরেই রয়েছে খোদাই করা দুটো সিংহের প্রতিমূর্তি। সেটা পেরিয়ে চলে এলাম রাজবাড়ির লাগোয়া উদ্যানে। মোগল বাদশাদের 'চারবাগ' রাজা সূরজমলকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল এখানেও ওই ধরণের বাগিচা বানাবার। দীগের নিজস্ব 'চারবাগ'-এর মাঝখান দিয়ে তৈরি হয়েছিল পায়ে চলার পথ। স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে রংবেরং-এর গাছগাছড়া, সুবিন্যস্ত ফুলের কেয়ারি আর শোভা বাড়িয়ে দিয়েছে সারি সারি ফোয়ারার জলের ধারা। দুপাশে রয়েছে 'গোপাল সাগর' আর 'রূপ সাগর' নামে বড় বড় দুটি জলাশয়। স্পষ্ট বোঝা যায় এই সব ফোয়ারা বা জলাশয়ের উপস্থিতির কারণ শুধুমাত্র বাগিচার

সৌন্দর্য বৃদ্ধি নয়, চারপাশের প্রাসাদের তাপমান কমিয়ে রাখার এ ছিল আরেকটি প্রক্রিয়া। কথিত আছে দীগ প্রাসাদে নাকি এককালে নয়শোটি ফোয়ারা বসানো হয়েছিল। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের সময় একসঙ্গে এই সব ফোয়ারা ব্যবহার করে উৎসবের একটা আলাদা মেজাজ দেওয়া হত।

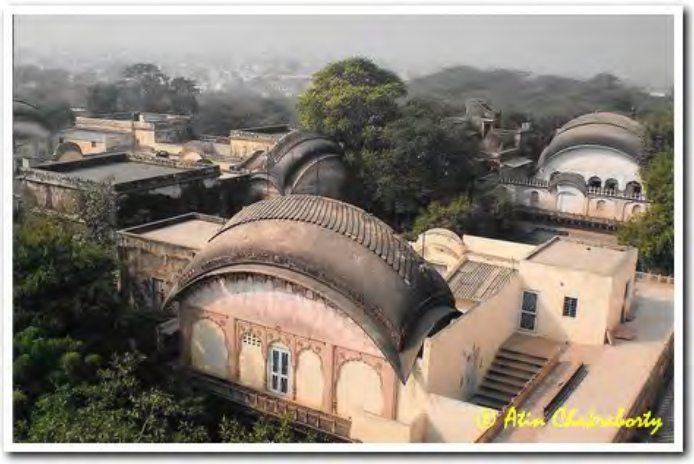

উত্তর-পূর্ব কোণে নজরে আসবে সত্তর ফিট উঁচু প্রধান ওয়াচ-টাওয়ার 'লক্ষ ভুজ', যার ওপর থেকে অনেক দূরে থাকা শত্রুপক্ষকে নজরে রাখা যেত। এরকম অনেক ওয়াচ-টাওয়ার এই দুর্গে এখনও দেখা যায়। দেখতে পাওয়া যাবে সেই সময়ের গর্জনশীল ছোট-বড় নানান কামান। অতীতে শত্রুনিধনের জন্য ব্যবহৃত হলেও আজ নিশ্চুপ, অনেক ক্ষেত্রে অবহেলিত হয়ে মরচে ধরে গেছে। হাঁটতে হাঁটতে রূপ সাগরের ঠিক ডান দিকে অবস্থিত কেশব ভবনে এসে গেলাম। অষ্টভুজ ভিত্তির ওপর এটি মনসুন প্যাভিলিয়ন বলেই পরিচিত। পাঁচটা করে খিলান দিয়ে ভাগ করা হয়েছে। ভেতরে বয়ে চলেছে জল প্রণালী। এখানেও রয়েছে শ'খানেক ফোয়ারা। প্রাসাদের ভেতরেই চারদিকে জলপ্রণালীর সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে, যার প্রাচীরের গায়ের সঙ্গে বসানো রয়েছে ক্ষুদ্রছেদ যুক্ত ওয়াটার জেটের সারি। মহলের ওপর থেকে ভেসে আসছে মেঘের গুরু গুরু আওয়াজ। অনেকগুলো গোলককে জলের মৃদু মন্দ ধাক্কায় ওপরে বসানো পাইপের ভেতরে ঘোরানো হচ্ছে, আর তাতেই সৃষ্টি হয় নকল বর্ষার এই মেঘের ঘর্ষণের আওয়াজ। কারিগরি দক্ষতার নিদর্শন রয়েছে এই সব সৃষ্টিতে। এই পরিবেশের মাঝে শুষ্ক মরুভূমির দেশে রাজপরিবারের সদস্যরা বর্ষার আমেজে হোলি খেলেন আজও। হোলি উৎসবে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে তখন কেশব ভবন। কাপড়ের থলিতে রেখে নানান রং রেখে সেই পুঁটলিগুলি ফোয়ারার ওয়াটার জেটের মুখে বেঁধে দেওয়া হয় - শুরু হয় হোলির প্রাণোচ্ছাস উৎসব। সত্যি প্রশংসার দাবি রাখে তাঁদের এই রকম সুন্দর এক চিন্তা ভাবনার।

কেশব ভবনে আসার আগে বাগানে দেখে এসেছিলাম জাঠ রাজাদের আরেক গৌরবের স্মৃতির অলংকার - শ্বেত পাথরের তৈরি দোলনার একটি সুন্দর স্ট্যান্ড। কথিত আছে একসময় বেগম নূরজাহানের দোলনায় এটির ব্যবহার হত, মোগল বাহিনীকে পরাস্ত করে জাঠের আদর্শ বীর সূরজমল এটিকে যুদ্ধজয়ের ট্রফি হিসাবে দীগে নিয়ে আসেন। আজও এটি পরাক্রান্তশালী জাঠদের বীরত্বের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে দীগের বাগিচায় শোভা বর্ধন করে চলেছে।

কেশব ভবন থেকে এরপর এসে উপস্থিত হলাম দীগের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজপ্রাসাদ গোপাল ভবনে। কমপ্লেক্সের পশ্চিমে অবস্থিত ফিকে লাল বেলেপাথরের তৈরি এই প্রাসাদ হল এখানকার প্রধান বিল্ডিং। ঔরঙ্গজেবের সময় যেসব শিল্পীরা মোগল বাদশার দরবারে কাজ করেছিল, তাদের অনেককে এখানে এনে রাজা সূরজমল এই প্রাসাদের রূপদানের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। গোপাল ভবনের বেশিরভাগ অংশই এখন দীগ প্যালেস মিউজিয়াম (Deeg Palace Museum)। ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ (Archaeological Survey of India) এর তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে। প্রাসাদমহলের ভেতরে রক্ষিত আছে রাজপরিবারের ব্যবহৃত নানাবিধ সম্পদ। রাজা সূরজমল যে কতটা শৌখিন ছিলেন তা বোঝা যায় মহলের ভেতরে ঘুরতে ফিরতে। সেন্ট্রাল হল, ইংলিশ আর ইন্ডিয়ান স্টাইলের ডাইনিং হল, বিলিয়ার্ড রুম, মহারাজার বেডরুম, রানি আর জেনানাদের থাকার আলাদা আলাদা একপ্রস্থ ঘর ইত্যাদি এই সব কিছুই তাঁর রুচিবোধের সাক্ষ্য। এছাড়া পর্যটকরা মুগ্ধনয়নে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে যান চন্দনকাঠের তৈরি বেণুগোপালের মূর্তিটির কাছে।

প্রাসাদের দুপাশে সংলগ্ন রয়েছে আরও দুটো ছোট ছোট প্রাসাদ - শাওন ও ভাদোঁ ভবন। সেন্ট্রাল হলের দুপাশে নীচের দিকে সংযুক্ত রয়েছে বেশ কিছুটা অংশ। সামনের দিকে জল রেখে ব্যবস্থা করা হয়েছে ভবনকে গ্রীষ্মের প্রখর তাপের হাত থেকে মুক্ত রাখার - যাকে বলা যায় সামার রিসর্ট। উত্তর দিকে রাখা একটি কালো পাথরের সিংহাসন, মহারাজ জহর সিং ১৭৬৪ সালে দিল্লিজয়ের তোফা হিসাবে এটিকে এনে দীগে রেখেছিলেন। দীগের চারদিকেই নজরে আসবে এইরকম কত সুন্দর সুন্দর কারুকার্যখচিত গেট, অলঙ্কৃত নানা ধরণের বিম, বা মোগল যুগের অপূর্ব সব পাথরের জালির কাজ, আসবাবপত্র, নিত্য ব্যবহারের সৌখিন নানা সামগ্রী। দীগের মিউজিয়ামে দেখতে পাওয়া যাবে রাজা-মহারাজাদের পরিবারের ব্যবহৃত সৌখিন নানা সামগ্রী। দীগের মিউজিয়ামে দেখতে পাওয়া যাবে রাজা-মহারাজাদের পরিবারের প্রায় সাড়ে পাঁচশো দলিলপত্র।

গোপাল ভবনের কাছেই রয়েছে আরো দুটো প্রাসাদ - সূরজ ভবন ও কিষাণ ভবন। ১৭৫৬-৬৩ সালে মহারাজ সূরজমল এই গোপাল ভবন আর কিষাণ ভবন প্রতিষ্ঠা করেন। কিষাণ ভবন ধূসর বেলেপাথরে তৈরি - রয়েছে সারি সারি ফোয়ারা। ওপরে বিশাল একটি জলাধার - ছয় থেকে সাত গ্যালন জল ধরে রেখে নিয়মিত এইসব জল প্রণালী বা ফোয়ারায় জল জোগান দিত। হামামের পদ্মফুলের আকৃতির ফোয়ারাটাও বেশ নজর টানে। অনুরোধ করে তালা খুলিয়ে হামাম দেখবার সুযোগ হয়েছিল। চক্ষু সার্থক হয়ে যায় সূরজ ভবন দেখে। পাথরের তৈরি একতলা বিশাল বিল্ডিং। শুধু পাথর বললে বোধহয় বোঝানো যায় না - কতো রকম রংবেরং-এর পাথরে অলঙ্কৃত করা হয়েছে এই প্রাসাদকে। চারদিকে বারান্দায় ঘিরে রেখেছে এটিকে। তার মাঝে রয়েছে পাঁচটি চোখধাঁধাঁনো অলঙ্কৃত খিলান। ভবনের পেছন দিকে তাকালে চোখে পড়বে হরদেব ভবন।

মাঝবরাবর বাগানটির উত্তরদিকে রয়েছে নন্দ ভবন, যার বিশেষত্ব সেন্ট্রাল হলের ভেতরের ছাদের সিলিং বানানো হয়েছে কাঠের সাহায্যে।
এরপর পৌঁছলাম জাঠদের প্রথম রাজা বদন সিং-এর রাজভবনে, যা 'পুরানা মহল' বলেই সবার কাছে আজকাল পরিচিত। বীরপুত্র সূরজমলের পিতা রাজা বদন সিং মোটামুটি ১৭২১ -১৭২২ সালে দীগেতে এসে প্রথম বানিয়েছিলেন তাঁর এই রাজপ্রাসাদ। বলা যেতে পারে জাঠদের প্রথম ভিত্তিস্থাপন এই দীগের মাটিতে সেদিন হয়েছিল। আর দীগ হয়েছিল জাঠদের প্রথম রাজধানী।

দীগের নাম কিন্তু স্কন্দপুরাণে অনেক কাল আগে থেকেই উল্লেখ করা হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরিক্রমার পথে 'দীর্ঘ' বা 'দীঘপুর' এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী কালে সংক্ষেপে সেই নামই দীগ বলে সবার কাছে পরিচিত হয়ে এসেছে।
সেপ্টেম্বর মাসে তিন দিনের বিশেষ মেলায় দীগ হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। উৎসাহী দর্শকদের আগমনে ভরে ওঠে দীগ প্যালেস কমপ্লেক্স। গ্রাম্য মেয়েদের রংচঙে পোষাক আর ছেলেদের মাথায় রঙিন পাগড়ি প্রাচীন রাজস্থানী সংস্কৃতির একটু ছোঁয়া এনে দেয় সেদিন সবার মনে। রূপকথার কাহিনির মত তখন জেগে ওঠে প্রাচীন এই দুর্গ-রাজপ্রাসাদ।
একটি কমপ্লেক্সের মধ্যেই এতগুলি সুন্দর সুন্দর রাজপ্রাসাদ-মহল-তালাব-ফোয়ারার সমাবেশ দুর্গ-প্রাসাদের দেশ রাজস্থানেও বিরল। মোগল-রাজপুত শিল্প-স্থাপত্যবিদ্যার অপরূপ মেলবন্ধনের সাক্ষী এই দীগ। চোখ ধাঁধাঁনো এই দুর্গপ্রাসাদ যেন এক রাজকীয় স্বপ্নের বহিঃপ্রকাশ বলেই বারবার মনে হতে লাগল। তখনকার দিনের বাঙালি স্থপতি বিদ্যাধর ভট্টাচার্যের নাম এখানকার অনেক নকশার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সূরজমল হাভেলির এক জায়গায় বাঙালির নিজস্ব ঘরানা বাঁশের সুন্দর ছাউনি স্বাভাবিকভাবেই নজরে পড়ে যায় আমাদের।
হাঁটতে হাঁটতে ঘন্টার পর ঘন্টা নিমেষে কেটে গেল মুগ্ধতার আবেশে। দীগ থেকে এবার ফিরে যাওয়ার পালা। সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিম আকাশে। তার শেষ আলোটুকু রাঙিয়ে দিয়েছে বীর জাঠ রাজাদের এককালের গরিমাময় আবাসস্থল। রম্যাণী এ দৃশ্য বারবার পেছনে ফিরে দেখারই মতো। এই পড়ন্ত বেলায় গোপাল সাগরের ওপর গোপাল ভবনের প্রতিবিম্ব যেন স্থির জলে ভেসে থাকা একটি পুরানো দিনের জাহাজ। দিনের শেষে বিদায়মুখী পর্যটকদের অনেকের কাছে এ এক অপূর্ব আদরণীয় দৃশ্য - ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, অনুভব করবার বস্তু।

'নহী জাঠনী নে সহী ব্যর্থ প্রসব কী পীর।
জন্ম উসকে গর্ভ সে সূরজমল সা বীর।'

অবিভক্ত ভারতের রাজশাহী জেলার নওগাঁতে জন্ম অতীন চক্রবর্তীর। সরকারি পেশা এবং ভ্রমণের নেশার টানে ঘুরেছেন ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিতভাবে গল্প ও ভ্রমণকাহিনি লিখছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে পেয়েছেন একাধিক পুরস্কারও।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly , please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory .

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • W eb Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

তুঙ্গনাথ-চন্দ্রশিলা আর মায়াবী চাঁদের দেওরিয়াতাল

পল্লব চক্রবর্তী

~ তুঙ্গনাথ-চন্দ্রশিলা-দেওরিয়াতাল ট্রেকরুট ম্যাপ ~ তুঙ্গনাথ-দেওরিয়াতাল-এর আরও ছবি ~

এখনও ট্রেন দেখলে ছেলেবেলার মতো মন ভালো হয়ে যায়, এখনও দূরপাল্লার ট্রেনে চেপে বসলে মনে আসে অনাবিল মুক্তির আস্বাদ। এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে কলকাতার প্রবল গরমে ঘামতে ঘামতে যখন হাওড়া স্টেশনে কুম্ভ এক্সপ্রেসে উঠলাম, মনে হল পিছনে ফেলে এলাম রোজকার একঘেয়ে জীবনটাকে। এবার সঙ্গী সহকর্মী ও বন্ধু রাজীব। সেই কবে দেওরিয়া তালের ছবি দেখার পর থেকে আমার স্বপ্ন দেখা আর দিন গোনা শুরু। এবার সুযোগ হতেই রাজীবকে সঙ্গী করে ব্যাগ পিঠে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। দেওরিয়া তাল ট্রেকের সঙ্গে জুড়ে দিলাম পঞ্চকেদারের সর্বোচ্চ তুঙ্গনাথ মন্দির আর চন্দ্রশিলা ট্রেক। দুটো জায়গাতেই মোটে তিন চার কিলোমিটার হাঁটা পথ। তাই অল্প কষ্টে একরাশ প্রাপ্তির স্বপ্ন দুচোখে নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু।

ঘণ্টাখানেক লেট করে ট্রেন যখন হরিদ্বার পৌঁছাল তখনও বিকেলের আলো ফুরিয়ে যায়নি। স্টেশনে নেমেই ছুটলাম পরের দিনের উখিমঠগামী বাসের টিকিট বুক করতে। উখিমঠকে কেন্দ্র করেই তুঙ্গনাথ, চন্দ্রশিলা আর দেওরিয়া তাল ট্রেক করব। ঠিক করলাম সকাল সাতটার গৌরীকুণ্ডের বাসে কুণ্ডে নেমে কিছু একটা ব্যবস্থা করে সাত কিলোমিটার দূরে উখিমঠ চলে যাব। উঠলাম পূর্বপরিচিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে।

পরদিন ঠিক সময়ে বাস ছাড়ল। হৃষীকেশ পেরিয়ে গঙ্গার তীর ধরে এগোতে থাকলাম। দেখতে দেখতে এসে গেলো দেবপ্রয়াগ; এখানে গঙ্গোত্রী থেকে নেমে আসা ভাগীরথী আর বদরীনাথ থেকে আসা অলকানন্দা মিশেছে। দেবপ্রয়াগ পার করে এক জায়গায় বাস থামল। আলুর পরোটা আর চা খেয়ে আবার বাস যাত্রা। মেঘমুক্ত ঝকঝকে নীল আকাশ আর বহু নিচে বয়ে যাওয়া পান্নাসবুজ অলকানন্দাকে সঙ্গী করে পাহাড়ের গা বেয়ে আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে ক্রমশ এগিয়ে চলা। ভাবতে অবাক লাগে কত শত বছর ধরে দেবভূমি গাড়োয়ালের এই রাস্তা ধরে পায়ে হেঁটে গেছে কত পুণ্যাকাঙ্খী কিংবা প্রকৃতিপ্রেমী মানুষের দল। তখন রাস্তা ছিল দুর্গম - বিপদ এবং শ্বাপদ সঙ্কুল।

দেখতে দেখতে পেরিয়ে এলাম শ্রীনগর তারপর রুদ্রপ্রয়াগ। বেশ ব্যস্ত এবং জমজমাট পাহাড়ি শহর রুদ্রপ্রয়াগ। দেখে বোঝার উপায় নেই যে ২০১৩ সালের জুন মাসের মাঝামাঝি কী প্রলয় ঘটে গিয়েছিল এ শহরের ওপর। সেবারের বিধ্বংসী বন্যায় গাড়োয়ালের কম বেশি সব এলাকাই বিধ্বস্ত হয়েছিল, চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল রুদ্রপ্রয়াগ আর তার ওপরের এলাকাগুলো। বিশেষত কেদারনাথ থেকে শুরু করে মন্দাকিনী নদীর তীরবর্তী এলাকা একেবারে মুছে গিয়েছিল। কিন্তু সময় থেমে নেই, থেমে নেই মানুষের জীবনও।

একটু বিরতির পর আবার যাত্রা শুরু, এবার মন্দাকিনীর তীর ধরে কেদারনাথের দিকে। রুদ্রপ্রয়াগের পর থেকে বাস ঢিমে তালে চলছে। স্থানীয় মানুষজন বাসে উঠছেন, নামছেন। বেশ ভিড় । এতক্ষণ একটানা বসে থেকে ক্লান্ত লাগছে। এমন সময় চন্দ্রপুরীর একটু আগে দৈত্যাকার চৌখাম্বা প্রথমবার দেখা দিল আমাদের। শরীরে যেন নতুন বল পেলাম, মনে নতুন উৎসাহ। এ ভাবেই পৌঁছে গেলাম কুণ্ড। নেমে পড়লাম আমরা। বাস চলে গেল গুপ্তকাশী হয়ে গৌরীকুণ্ডের দিকে। এখান থেকে পেয়ে গেলাম শেয়ার জীপ, আমাদের নামিয়ে দিল উখিমঠে ঠিক ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বড় গেরুয়া বাড়ির সামনে, শেষ হল আমাদের টানা আট ঘণ্টার সফর।

শহরের এক নির্জন প্রান্তে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বাড়িটার ঠিক পাশ থেকেই শুরু হয়েছে মন্দাকিনীর গভীর আর খাড়া নদীখাত। জানলা দিয়ে তাকালে চোখে পড়ে বহু নিচে ক্ষীণ ধারায় বয়ে চলেছে নীলচে সবুজ জলরাশি। নদীর ওপারে গুপ্তকাশী শহর। ঘর থেকেই দেখা যায় কিছু তুষার শৃঙ্গ। সব মিলিয়ে অসাধারণ পরিবেশ। এই অবেলায় ঠান্ডা ডাল ভাত তরকারি খেয়ে পিত্তি রক্ষা করে দুজনে গেলাম শান্ত, ছোট্ট উখিমঠ শহরটা ঘুরে দেখতে। টুকটাক কেনাকাটা আর পরদিন সকালে চোপতা যাওয়ার গাড়ি ঠিক করে ঘরে ফিরলাম যখন, সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, দূর পাহাড়ে জোনাকির মতো জ্বলে উঠেছে আলো, ওটাই গুপ্তকাশী শহর। সন্ধ্যারতি দেখে একটু বসতে না বসতেই রাতের খাবার খাওয়ার ডাক এল। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের রান্নায় তেল, ঝাল, মশলার হয়তো অভাব থাকতে পারে কিন্তু আন্তরিকতার অভাব নেই। কাল খুব ভোরে উঠতে হবে, যেতে হবে চোপতা, শুয়ে পড়লাম তাড়াতাড়ি করে। বিছানাতে গা এলিয়ে দিতেই সারাদিনের ক্লান্তিতে চোখ জুড়ে এল...তখনও কানে আসছে বহু নিচে বয়ে যাওয়া মন্দাকিনীর মিষ্টি শব্দ।

পরদিন সকাল সাতটায় রওনা দিলাম তিরিশ কিলোমিটার দূরে চোপতার উদ্দেশ্যে। গত কয়েকদিনের মতো আজও আকাশ সম্পূর্ণ মেঘমুক্ত, ঝকঝকে নীল। সকালের নরম রোদ্দুর ছড়িয়ে পরেছে পাহাড়ের আনাচে কানাচে, দুপাশে ঘন সবুজ বনানী, এরই মাঝে লুকোচুরি খেলা চলছে চৌখাম্বা সহ বেশ কিছু তুষার শৃঙ্গের সঙ্গে, মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে গোলাপী রঙের ফুলে ঢেকে যাওয়া রডোডেনড্রন গাছ। এমন ভরা প্রকৃতির মাঝে ভরে আছে মনও। অদম্য উৎসাহ আর উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করছি কখন চোপতা আসবে, হাঁটতে শুরু করব তুঙ্গনাথের পথে।

এ ভাবে কখন যে কেটে গেল এক ঘণ্টার পথ, গাড়ি থামল চোপতা। সবুজ বুগিয়াল, দূরে শ্বেতশুভ্র তুষার শৃঙ্গের হাতছানি আর ফুলের ভারে নুইয়ে পরা রডোডেনড্রন গাছ - সবমিলিয়ে চোপতা এক অসাধারণ জায়গা। কিছু খাবারের দোকান আর দু একটা ছোটোখাটো হোটেল নিয়ে এই পাহাড়ি জনপদ এখনও শহুরে সভ্যতার আগ্রাসনের বাইরে থেকে গেছে। আর দেরি না করে তুঙ্গনাথের পথ ধরলাম। শুধু তুঙ্গনাথই নয়, যাব আরও প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরের চন্দ্রশিলাও।

একটা ছোট গেট, তারপর ধাপে ধাপে উঠে যাওয়া সিমেন্টবাঁধানো চমৎকার চলার রাস্তা। শুরু হল যাত্রা। মাথার ওপর গাছের চাঁদোয়া, দুপাশে ফুলভর্তি রডোডেনড্রন গাছের সারি। এরই মাঝে উঁকি দিচ্ছে বেশ কিছু তুষারশৃঙ্গ, আবার কখনও তারা হারিয়ে যাচ্ছে পথের বাঁকে। সুন্দর রাস্তার ধারে মাঝে মাঝে বসার জায়গা করা আছে। মোটেও কঠিন চড়াই নয়, রাজীব আর আমি দিব্যি গল্প করতে করতে এগিয়ে চলেছি। কিছুটা চলার পর বাঁ দিকে দেখা গেল দারুণ সুন্দর একটা সবুজ বুগিয়াল আর উত্তরদিগন্তে চৌখাম্বা, কেদারনাথ, কেদারডোম এবং আরো সারি সারি নাম না-জানা তুষারশৃঙ্গ। এখানেই পেয়ে গেলাম ছোট্ট একটা চায়ের দোকান। গরম চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে দুচোখ ভরে দেখতে থাকলাম চারপাশ। চা পর্ব শেষে আবার পদযাত্রা শুরু। এবার চড়াই ক্রমশ বাড়ছে, পাল্লা দিয়ে কমছে হাঁটার গতি। বহু নিচে দেখা যাচ্ছে ফেলে আসা বুগিয়াল আর চায়ের দোকানের চকচকে টিনের চাল। খানিকটা যাওয়ার পর প্রথমবার বরফ পেলাম রাস্তার ধারে। মনে হয় দু-তিনদিন আগে বোধহয় তুষারপাত হয়েছিল। এর একটু পরেই অনেক ওপরে চোখে পড়ল তুঙ্গনাথ মন্দির সহ কিছু বাড়িঘর। মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিয়ে এক সময় পৌঁছে গেলাম পঞ্চকেদারের সর্বোচ্চ তুঙ্গনাথ মন্দির। যথারীতি মন্দিরের দরজা বন্ধ, এখন তুঙ্গনাথ মহাদেবের পুজো হচ্ছে উখিমঠের ওঙ্কারেশ্বর মন্দিরে। বিগ্রহ আবার এই মন্দিরে ফিরে আসবে মে মাসের কোনও এক সময়ে। ছোট মন্দির, যেন কেদারনাথ মন্দিরের রেপ্লিকা। আশপাশে বেশ বরফ পড়ে আছে। আছে বেশ কিছু দোকানঘর আর থাকার জায়গা, তবে তাদের দরজাও মন্দিরের মতোই বন্ধ। শুধু একটা দোকান খোলা পেলাম, সেখানে গরম গরম নুডলস দিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে আবারও পথে নামলাম। এবার যাব আরও প্রায় এক হাজার ফুট ওপরে এই পাহাড়ের সর্বোচ্চ স্থান চন্দ্রশিলা।

রাস্তা যেন বেশ খাড়াই লাগছে এবার। বরফের পরিমাণ বাড়ছে। মাঝে মাঝে পা স্লিপ করছে। অত্যন্ত সন্তর্পণে এক পা এক পা করে এগোচ্ছি, কিন্তু তাতেও যেন নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। পায়ের নিচে বাঁধানো রাস্তা শেষ হয়ে গেছে অনেক আগেই, এখন মোটামুটি চলার উপযোগী সরু রাস্তা, জায়গায় জায়গায় বেশ বিপজ্জনক। অন্য দিকে সূর্যের তাপ ক্রমশ বাড়ছে। এক সময় শেষ হল কষ্টকর পদযাত্রা, পৌঁছলাম চন্দ্রশিলা। এখানেও একটা ছোট্ট মন্দির। চারদিকে ইতস্তত বরফ পড়ে আছে। উত্তর দিগন্তে একশো আশি ডিগ্রি জুড়ে দেখা যাচ্ছে একের পর এক তুষার শৃঙ্গ। গাড়োয়ালের বিখ্যাত শৃঙ্গগুলোর পাশাপাশি চোখে পড়ল নন্দাদেবী, ত্রিশূল সহ কুমায়ুনের আরও বেশ কিছু শৃঙ্গও। তুঙ্গনাথে রাতে থাকতে পারলে ভোরের আলোতে এ দৃশ্য আরও স্বর্গীয় হতে পারত। আফশোস হল, এ যাত্রায় চন্দ্রশিলায় রোমাঞ্চকর সূর্যোদয় দেখা থেকে বঞ্চিত হলাম।

চোপতায় নেমে এলাম যখন, জোর খিদে পেয়ে গেছে। খাওয়া দাওয়া সেরে উখিমঠের ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে ফিরে আসতে আসতে চারটে বাজল। সারাদিন পা দুটোর ওপর দিয়ে খুব ধকল গেছে, শরীর চাইছে বিশ্রাম। কাল আবার যাব দেওরিয়া তাল - আমাদের এই সফরের মূল আকর্ষণ, সেখানে তাঁবুতে কাটাব এক রাত।

পরদিন আবার ঠিক সাতটায় বেরিয়ে পড়লাম সারিগ্রামের উদ্দেশ্যে। প্রথম দিকে চোপতাগামী রাস্তা ধরে সাত কিলোমিটার যাওয়ার পর বাঁ দিকের একটা রাস্তা ধরে আরও কিলোমিটার দুয়েক গেলেই আসে সারি। এখানে আমাদের অপেক্ষায় ছিল গাইড কাম কুক হর্ষবর্ধন নেগি। সদ্য

কৈশোর পেরোনো হর্ষবর্ধনকে সঙ্গী করে এগোতে থাকলাম দেওরিয়াতালের চড়াই পথে। মোটামুটি আরামদায়ক রাস্তা আর দূরত্ব তিন কিলোমিটারেরও কম। কিলোমিটার খানেক ওঠার পর চড়াই অনেকটা কমে এল। এবার পথ শুরু হল জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। দুপাশে ভর্তি রডোডেনড্রন গাছ। এখানে ফুলের রঙ চোপতার মতো গোলাপি নয়, বরং টকটকে লাল, আলোয় আলো হয়ে আছে চারপাশ। ভুলে গেলাম পথের যত ক্লান্তি। এই ফুলের দেশের মাঝখান দিয়ে রাস্তা যেন শেষ হয়ে গেল বড় তাড়াতাড়ি, চোখে পড়ল কিছু দোকান, বুঝলাম প্রায় এসে পড়েছে স্বপ্নের দেওরিয়াতাল।

একটা দোকানে বসে টোস্ট ওমলেট আর চা দিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে কয়েক পা যেতেই দুচোখে বিস্ময়ের ঘোর লেগে গেল। মাথার ওপর বিশাল একখানা ঘন নীল আকাশ, পায়ের নিচে সবুজ ঘাসের চাদরে ঢাকা তৃণভূমি - যাকে গাড়োয়ালি ভাষায় বলে বুগিয়াল, সামনে মাঝারি আকারের পান্না সবুজ রঙের জলাশয় আর যেন ঠিক তার পরেই শুরু হয়েছে দিগন্তজোড়া তুষারশৃঙ্গরাজি যার মধ্যে সবার আগে চোখে পড়ে বিশাল বপু চৌখাম্বাকে। এটাই দেওরিয়া তাল - দেবতাদের স্নানের জলাশয়। দৃশ্যটা এত সুন্দর যে মনে হয় যেন স্বপ্নের ভিতর আছি কিংবা কোনও নামী শিল্পীর আঁকা ল্যান্ডস্কেপ দেখছি।

পিঠের ভারী স্যাকটা ফেলে বসে পড়লাম ঘাসের ওপর। মনে হল এভাবেই বসে থাকি, কেটে যাক অনন্ত সময়। তাড়া লাগাল হর্ষবর্ধন, আমাদের টেন্ট নাকি একটু দূরে, আপাতত সেখানেই যেতে হবে। অগত্যা তালের ডান দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম হর্ষবর্ধনকে অনুসরণ করে। আবার ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চড়াই, আবার সেই ফুলে ছেয়ে যাওয়া রডোডেনড্রন গাছের সারি। একটু যেতেই চোখে পড়ল বেশ কিছু তাঁবু খাটানো আছে। তাঁবুর ভিতর ক্যাম্প খাট, বিছানা সব আছে, পাশে কাজ চালানোর মতো বাথরুম আছে, আছে পাথর সাজিয়ে তৈরি ছোট্ট রান্নাঘরও। চারপাশে বেশ ঘন জঙ্গল আর ফুলে ভরা রডোডেনড্রন গাছের সমাহার। তার ফাঁকে বেশ নিচে দেখা যাচ্ছে দেওরিয়া তাল। আর চৌখাম্বাকে অনেক কাছে লাগছে। হর্ষবর্ধন দেখাল ডানদিকে বহুদূর চোপতা আর তুঙ্গনাথ-চন্দ্রশিলা পাহাড়। এরপর ঝটপট চা বানাতে লেগে গেলো সে। ব্যাগপত্তর রেখে, চা খেয়ে আমি আর রাজীব ফের গেলাম তালের পাশে, আর হর্ষবর্ধন দুপুরের রান্নার জোগাড় করতে লাগল। এবার দেখলাম দু-একজন করে ট্রেকার এসে পৌঁছাচ্ছে, এক এক করে লাল, নীল পোর্টেবল টেন্ট পরছে দেওরিয়াতালের পাশে, এমন কী শোনা যাচ্ছে বাংলা কথাও। তির তির করে বয়ে যাওয়া মিষ্টি হাওয়াতে কাঁপছে তালের জল, তাই দেওরিয়াতালের জলে তুষারশৃঙ্গের বহুশ্রুত প্রতিফলন দৃশ্য আমাদের অধরা। কিন্তু যা পেলাম তাই বা কি কম! এতো সারা জীবনে অক্ষয় হয়ে থাকা স্মৃতি। ক্রমশ লোকজন বাড়তে লাগলো, স্বর্গীয় নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে খান খান হয়ে বেশ গমগম করতে লাগলো চারপাশ। খুলে গেলো তালের পাশে থাকা বন দপ্তরের ছোট্ট বিট অফিস। নাম নথিভুক্ত করে আবার তাঁবুর দিকে এগোলাম।

দুপুরে খিচুড়ি বানিয়েছে হর্ষবর্ধন। আচার সহযোগে অমৃতসমান খিচুড়ি খেয়ে ক্যাম্পখাটে শুয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে ফের একবার গেলাম তালের পাশে। এবার যখন ফিরলাম তখন দিন ফুরিয়ে এসেছে। সোলার ল্যাম্পের টিমটিমে আলোয় মনে হল নিস্তব্ধ নিঃসঙ্গ এই পরিবেশে আমরা যেন বিশ্বজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন। একটু গা ছমছম করতে লাগল। হঠাৎ চোখে পড়ল তুঙ্গনাথ-চন্দ্রশিলা পাহাড়ের ঠিক মাথার হলুদ রঙের আলো। চমকে উঠলাম, পরক্ষণে বুঝলাম চাঁদ উঠছে, মনে পড়ল গত কাল পূর্ণিমা গেছে। ক্রমশ পাহাড়ের মাথা ছাড়িয়ে ওপরে উঠতে লাগল চাঁদ। স্নিগ্ধ পেলব আলোয় ভেসে গেল চারপাশ, মায়াবী আলোয় ধুয়ে গেল এ বিশ্বচরাচর। নিজেকে মনে হল এক কল্পলোকের বাসিন্দা। এই অবাককরা চাঁদের আলোয় নতুন রূপে দেখলাম চৌখাম্বাকে। এরই মাঝে হর্ষবর্ধন বানিয়ে ফেলেছে গরম গরম রুটি আর ডিমের কারি, সময় হয়ে গেছে রাতের খাবার খাওয়ার।

পরদিন একেবারে ব্যাগ গুছিয়ে যখন নেমে এলাম তালের পাশে তখনও ভালো করে দিনের আলো ফোটেনি। রংবেরঙয়ের ছোট ছোট তাঁবুতে তখনও ঘুমিয়ে সবাই। ক্রমে ভোর হল, সোনা রঙ ছড়িয়ে পড়ল আদিগন্ত তুষারচূড়াগুলোর মাথায়। শান্ত তালের জলে দেখলাম তাদের প্রতিফলনের সেই স্বর্গীয় দৃশ্য। তবে জল কম থাকায় ছবিতে দেখা দেওরিয়াতালের মত অত মোহময়ী রূপ ফুটে উঠল না। বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে বিদায় জানালাম দেওরিয়াতালকে, নামতে লাগলাম সারিগ্রামের পথে। হিসাবমত আমাদের এবারের বেড়ানো শেষ। কিন্তু হাতে এখনও পুরো দুটো দিন রয়ে গেছে। রাজীব বলল - চল আর একটা কোনও ছোট ট্রেক করি। উতরাই পথে হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে লাগলাম আর কোথায় যাওয়া যায়...

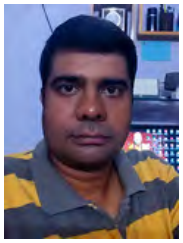

~ *তুঙ্গনাথ-চন্দ্রশিলা-দেওরিয়াতাল ট্রেকরুট ম্যাপ* ~ *তুঙ্গনাথ-দেওরিয়াতাল-এর আরও ছবি* ~

পদার্থবিজ্ঞানের স্নাতক পল্লব চক্রবর্তী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাণিজ্য কর দফতরের আধিকারিক। ভালোবাসেন নানা ধরণের বই পড়তে। নেশা ব্যাগ ঘাড়ে করে পরিবারের কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে কাছে বা দূরের ভ্রমণে বেড়িয়ে পড়া। বেশি পছন্দের পাহাড় আর বন। এক সময় দার্জিলিং-এ চাকরি করেছেন বেশ কিছু দিন। সেই থেকে পাহাড়ের সঙ্গে মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে পড়া।

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

ভূস্বর্গ সুইৎজারল্যান্ড

শ্রাবণী ব্যানার্জী

~ *সুইৎজারল্যান্ডের আরও ছবি* ~

ছোটবেলায় সুইৎজারল্যান্ড দেশটির সাথে আমার পরিচয় না থাকলেও বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে তার নাম আমার কানে আসত। এই যেমন ধরুন আমার পিতৃদেব তার 'টিসো ওমেগা' ঘড়িটি হাতে লাগিয়ে প্রায় প্রতিদিনই ভাঙ্গা রেকর্ডের মত আউড়ে যেতেন - 'দেখলি একেই বলে সুইস ঘড়ি, একদিনের জন্যও স্লো চললো না'। একবার দিল্লীতে এক পাঞ্জাবীর বাড়ি গিয়ে দেখি দেওয়ালে টাঙ্গানো একটা ছোট্ট কাঠের বাড়ি থেকে একটা পাখি বেড়িয়ে এসে 'ক্যুক্যু' বলে সময়টা জানিয়ে গেল আর গৃহস্বামীও গর্ব সহকারে বললেন 'দেখে রাখো, এটাই হল সুইৎজারল্যান্ডের কটেজ ডিজাইনের বিখ্যাত ক্যুক্যু ক্লক। জলা-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো এক অ্যাডভেঞ্চারাস দাদা এসে আমার জন্মদিনে একটি লাল টুকটুকে জিনিস দিয়ে বললেন--'এটাকে বলে সুইস আর্মি নাইফ, এর পেটের মধ্যে ছুরি, কাঁচি থেকে স্ক্রু ড্রাইভার সবই আছে, কোথাও ট্রেকিং এ গেলে নিয়ে যাস, কাজে দেবে।' বাবা মাঝে মধ্যেই রেডক্রস সংস্থাটি নিয়ে অনেক ভালো ভালো কথা বলতেন তাই জেনেছিলাম এই রেডক্রসের জন্মও সুইৎজারল্যান্ডে। সব থেকে বেশি খুশি হয়েছিলাম যেদিন পিতৃবন্ধু-প্রেরিত কয়েকটি সুইস চকোলেট আমার হাতে এসেছিল--খেয়ে মনে হয়েছিল --আহা ইহারেই বোধহয় কয় অমৃত!

প্রথমবার সুইৎজারল্যান্ডে গিয়ে দেশটির সৌন্দর্যে এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলাম যে মনে হয়েছিল এই দেশটিতে বারবার ফিরে আসা যায়। তুষারে ঢাকা পাহাড়ের পাদদেশে সবুজ ঘাসের আস্তরণ, সেখানে টুংটাং শব্দ তুলে চরে বেড়াচ্ছে ঘন্টিবাঁধা ভেড়ার দল আর তাদেরই ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ে ছোট ছোট ফুলে ঢাকা বাড়ি। পাহাড় ও স্বচ্ছ নীল হ্রদের পাশ দিয়ে কুউউ শব্দ তুলে যখন ধীরগতিতে ট্রেনগুলি চলে যায় তখন মনে হয় এ যেন কোনও স্বপ্নপুরীর দেশ যেখানে দুঃখ নেই, কষ্ট নেই শুধুই যেন এক অনাবিল আনন্দ। তাই পরলোকের স্বর্গের ভরসায় না থেকে কয়েকবছর আগে আবার সেই ভূ-স্বর্গ সুইৎজারল্যাণ্ডে গিয়েই হাজির হয়েছিলাম। মিলান থেকে ইতালি ও সুইৎজারল্যান্ডের বর্ডার তিরানোতে পৌঁছলাম কারণ উদ্দেশ্য ছিল 'বারনিনা' এক্সপ্রেসে চেপে সেন্ট মরিজ পৌঁছানো। বারনিনা ও গ্লেসিয়ার এক্সপ্রেস এই দুটি ট্রেনই এতটাই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে দিয়ে যায় যে গন্তব্যস্থলের থেকেও যাবার রাস্তাটাই তখন মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়।

জেমস বন্ডের 'গোল্ড ফিংগার' ম্যুভি দেখতে গিয়ে প্রথম সেন্ট মরিজের নাম শুনি। জলের ধারে ক্যাসেলের মত দেখতে বাডরুট প্যালেস হোটেলের পাশ দিয়ে যাবার সময় ড্রাইভার বলল এখানে প্রিন্স উইলিয়াম, টিনা টার্নার, বরিস বেকার ও জর্জ ক্লুনির মত লোকেরা ছুটি কাটাতে আসে। পাহাড় ও লেকের গা ঘেঁসে দুটি ছোট ছোট গ্রাম নিয়ে এই সেন্ট মরিজে দু-দুবার উইন্টার অলিম্পিক হয়েছিল। সারা বছরই এখানে ট্যুরিস্টদের আনাগোনা, কারণ বছরের মধ্যে তিনশো দিনই এরা সূর্যের মুখ দেখে। সূর্য ও শুভ্র তুষারের মিলনযাত্রাতে চোখ যেন ঝলসে যায় তাই সারাক্ষণ গগলস পড়ে থাকা ছাড়া কোন গতি নেই। অসামান্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি শীতকালে স্কি করার জন্যও জায়গাটি বিখ্যাত। সেন্ট মরিজ থেকে ঘন্টাখানেকের দূরত্বে 'ক্যু' বলে একটি জায়গায় ঘুরতে গেলাম। স্টেশনে নেমে কিভাবে হোটেলে যাব তার ম্যাপটা দেখতে যাচ্ছি এমন সময় দুটি দক্ষিণ ভারতীয় ছেলে হন্দদন্ত ভাবে আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এল। দুদিকে মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে তাদের ডিরেকশান দেওয়ার বহর দেখে তাকিয়ে দেখি সামনের এক সুইস ভদ্রলোকও দুদিকে মাথা নাড়িয়ে যাচ্ছেন যদিও তাঁর নাড়ানোর স্টাইলটা একেবারেই ভিন্ন। যাই হোক ছেলেদুটি চলে যেতে তিনি বেঠিক ডিরেকশানটিকে সঠিক করে আমাদের হোটেলে যাবার রাস্তাটি বাতলে দিলেন। স্টেশন থেকে বেরিয়েই দেখি একটি দোকানে প্রচুর ভারতীয় হাতের কাজের জিনিস বিক্রি হচ্ছে আর দরজার মুখে একটি ভারতীয় লোকের স্ট্যাচু যার গায়ে গোলাপী রঙের ফতুয়া, মাথায় হলুদ পাগড়ি, পরনে সৌভাগ্যবশত সাদা ধুতি ও পায়ে টিয়াপাখির রঙের নাগরাই জুতো। একটি হাত কোমরে ও একটি হাত মাথায় দিয়ে ভারতীয় পুরুষদের প্রতিনিধি হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে, দেখে মনমেজাজ দস্তুরমত খিঁচড়ে গেল। চতুর্দিকে ভেড়া চরে বেড়ানো সবুজ উপত্যকার ধারে পুরনো দিনের ক্যু শহরটি খুবই সুন্দর। পাথরে বাঁধানো রাস্তা ও তার ধারে ধারে রং বেরং এর ফুলের সমারোহ। পরের দিন সেন্ট মরিজে ফিরে আরও একদিন সেখানে কাটিয়ে 'গ্লেসিয়ার এক্সপ্রেস' ধরে জারম্যাটের দিকে রওনা হলাম। আপাদমস্তক কাঁচ দিয়ে মোড়া ধীরগামী ট্রেনটি তুষারে ঢাকা পাহাড় ও হ্রদের পাশ দিয়ে এমন ভাবে চলে যে ভেতরে বসে থাকলেও মনে হয় নিজেরাই যেন তাদের পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছি।

আট ঘন্টার ট্রেনজার্নিতে আমার পাশে বসা এক মহিলার সাথে আলাপ জমানোর ইচ্ছায় সুইৎজারল্যান্ডের কোথায় তার বাসস্থান জিজ্ঞাসা

করলাম। তিনি উত্তরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন 'মোরন'। আমি তো তাজ্জব। অ্যা! আমাকে খামোকা মোরন বলা? ভদ্রমহিলা আমার মুখ দেখে তাড়াতাড়ি ভাঙ্গা ইংরাজিতে বললেন উনি আমাকে গাল পাড়েননি কারণ উনি স্যুইৎজারল্যান্ডে 'মোরণ' নামক জায়গাটিতে থাকেন আর এতে নাকি আশ্চর্য হবার কিছুই নেই, কারণ ওনার এক বন্ধু জ্যুরিখের কাছে 'এগ' অর্থাৎ 'ডিম'-এ থাকেন। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম 'তা তোমাদের এই দেশটির নিকনেম কি?' উনি এবারে হাসি হাসি মুখে উত্তর দিলেন 'দ্য ল্যান্ড অব ক্যুক্যু ক্লক এন্ড চকোলেট'। জানালা দিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে সবুজ ঘাসের ওপর প্রচুর গরু চরতে দেখে ও স্যুইস চকোলেট খেয়ে তাদের দুধের কোয়ালিটিটা না হয় বোঝা গেল কিন্তু যখন উনি বললেন স্যুইস লোকেদের একদিনও চীজ আর মধু ছাড়া চলে না তাই এটাকে 'ল্যান্ড অব হানি এন্ড চীজ' বললেও অত্যুক্তি হয় না তখন কেমন একটু খটকা লাগলো। চকোলেট, চীজটা মানা গেলেও মধু এল কোথা থেকে? তারপরে অবশ্য ভেবে দেখলাম যে দেশ সারা পৃথিবীর দু-নম্বরী টাকার পিগি ব্যাঙ্ক তা সে দেশ মধু তো বটেই। মৌমাছির চাষ না হলেও মধুত্বের ব্যাপারে কোনও সন্দেহই থাকতে পারে না।

আমার সেই সহযাত্রীটির কাছ থেকে স্যুইৎজারল্যান্ডের অনেক কথাই জানতে পারলাম। এখানে যারা যে দেশের বর্ডারের কাছে থাকে সেই ভাষায় কথা বলে অর্থাৎ উনি জার্মান বললেও জেনিভার লোক ফরাসী ভাষা বলে এবং দক্ষিণ দিকে ইতালির সাথে বর্ডার হওয়ায় তাদের ভাষা ইতালিয়ান। কিছু অদ্ভুত আইনকানুনও জানা গেল। কি ভাগ্যি এদেশে ফুটপাথে ফুচকা, রোল, আলুকাবলি বা ধুলোর কোটিং দেওয়া মোচার চপ বিক্রি হয়না, তাই রক্ষে! এখানে রাত দশটার পর থেকে পেটের অসুখ করলে আপনি যতবার খুশি বাথরুমে গিয়ে বসে থাকতে পারেন, কিন্তু ফ্লাশ টানতে পারবেন না কারণ তার আওয়াজে আশেপাশের লোকাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে। বাড়িতে কানে খাটো লোক থাকলেও সাবধান, রাত দশটার পর জোরে কথা বলা মানা আর রবিবার ছুটির দিন লোকে সারাদিনই ঘুমোতে পারে, তাই ওয়াশিং মেশিন চালানোও নিষিদ্ধ। সারা সপ্তাহের ডাঁইকরা জামাকাপড় নিয়ে রবিবারে কাচতে বসবেন, তা সে গুড়েও বালি। আইনগুলি শুনে চমৎকৃত হয়ে গেলেও ভাবলাম উল্টোটা হলে আমাদের কতটা সুবিধা হত? পৈটিক গোলযোগ আপনার প্রতিদিন ঘটবে না কিন্তু আপনার পাশের ফ্ল্যাটেই কোন রক মিউজিসিয়ান যদি রাত দশটার পর তার সাধনা চালিয়ে যান কিংবা কোনও নৃত্যপটিয়সী ঠিক আপনার মাথার ওপরে তাতা থৈথৈ করতে থাকে, তখন আপনার ব্লাড প্রেশারটি কতটা চড়বে?

এ ছাড়াও মনে রাখবেন স্যুইস নাগরিক হবার কিছু সুবিধাও আছে। প্রতিটি নাগরিকের জন্য এখানে খাবার দাবার সমেত একটি করে বম্বশেলটার তৈরি করে রাখা আছে, অর্থাৎ কোনও অণু-পরমাণুর বাবার ক্ষমতা নেই এদের কোনও ক্ষতি করে। শুধু তাই নয়, সত্তর ভাগ পাহাড় দিয়ে ঢাকা এই দেশটি এতটাই উঁচুতে টং-এ চেপে আছে যে মনুবর্ণিত আর একটি মহা প্লাবন হলেও এরা শুকনো খটখটেই থেকে যাবে। একেই বলে কপাল! বিশ্বপ্রকৃতির এ যেন একটি অতি আদরের সুন্দরী মেয়ে, যাকে মা ঢেলে সাজিয়েছেন। গ্লেসিয়ার এক্সপ্রেসে বসে বাইরের সেই অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে দেখতে বার বার যেন নিজের অজান্তেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল, বাঃ কি সুন্দর!

জারম্যাটে নেমে দেখলাম এই স্টেশনটিও ফুলে ঢাকা। বাইরে বেরোলেই চোখে পড়বে সেই বিখ্যাত ম্যাটারহর্ন পিক - পিরামিডের মত শেপ নিয়ে একাই একশো হয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জারম্যাটে দিন দুয়েক কাটিয়ে স্যুইৎজারল্যান্ডের রাজধানী বার্নের দিকে রওনা হলাম।

১১৯১ সালে ডিউক বার্ডটোল্ড জীবনে প্রথম একটি ভাল্লুক শিকার করে এই জায়গাটির নাম দেন 'বার্ন' অর্থাৎ ভাল্লুক। শহরের চতুর্দিকেই ভাল্লুকের মুর্তির সাথে সাথে কিছু কিছু বেয়ার পিটও চোখে পড়ে। একটাতে দেখলাম বেশ কিছু ভাল্লুক ছানাপোনা নিয়ে বসে আছে আর দর্শকরা তাদের দেখে হাততালি দিচ্ছে। একটি আটশো বছরের পুরনো টাওয়ারের সামনে দেখলাম বিশাল ঘড়ির ভেতর থেকে ব্যান্ড বাজাতে বাজাতে কিছু পুতুল বেরিয়ে এসে সময়টা জানিয়ে দিয়ে গেল। এখান থেকে খুব কাছেই একটি ছোট্ট ফ্ল্যাটে উনিনশো পাঁচ সালে আলবার্ট আইনস্টাইন তার থিওরি অব রিলেটিভিটি আবিষ্কার করেন, পেটেন্ট ক্লার্ক হিসেবে তখন তিনি এই শহরেই কাজ করতেন। বাড়িটির সামনে দেখলাম লেখা আছে E=mc2 । বার্নের পুরনো সরু সরু পাথরের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনে হল এই পুরোনো বার্ন শহরটি নতুন বার্নের থেকে ঢের বেশি সুন্দর। বড় বড় পাথরে বাঁধানো স্কোয়ারে দেখলাম লোকজন ফুর্তিতে নাচগান, খাওয়াদাওয়া করছে আর এক জায়গায় রাস্তার ওপরেই বিশাল দাবার ছকে বড় বড় ঘোড়া নিয়ে লোকজন খেলছে ও আশে পাশের জনতা তাদের উৎসাহ দিচ্ছে। চতুর্দিকে লোকজনকে খেতে দেখে আমারও খিদে পেয়ে গেল, তাই ভাবলাম এদের বিখ্যাত ফন্ডুটা এই তালে খেয়ে নিই। ইংরেজিতে অর্ডার দিতে গিয়ে বিপত্তিতে পড়লাম, লোকটা আমার কথা এক বর্ণও না বুঝে ফিক ফিক করে হাসতে লাগল। মুখাভিনয়ে আমি মোটামুটি পোক্ত, তার আগের দিনই এক জায়গায় নিজের গায়ের হলুদ জামাটিকে আঙুল দিয়ে গোল করে কেটে ঠুকে ডিমের পোচ বুঝিয়েছিলাম, কিন্তু ফন্ডুর ব্যাপারে আমি একেবারেই অসহায়। ভাগ্যিস পাশের লোকটিও ফন্ডু খাচ্ছিল, তাই সেদিকে অঙ্গুলীনির্দেশ করেই কাজ সারা গেল। কিছুক্ষণ বাদে যখন ওয়াইনমেশানো উৎকট গন্ধযুক্ত কিছুটা সাদা টগবগে ফোটা চীজ আর ছোট ছোট করে কাটা শুকনো পাউরুটি এল, তখন তার ঘ্রাণেই অর্দ্ধ নয় পূর্ণ ভোজনংটাই মাঠে মারা গেল। বলা বাহুল্য চিমটে দিয়ে রুটিগুলো চীজে ডোবানো যতটা সহজে হ্ গলাদ্ধকরণটা ঠিক সেই স্পীডে হল না।

বার্নে থাকাকালীন একদিনের জন্য জেনিভা ঘুরে এলাম। লেকের ধারে রত্নের মতো জ্বলজ্বলে শহরটি ইউরোপের ইউনাইটেড নেশনের হেড কোয়ার্টার্স ছাড়াও রেডক্রসেরও জন্মস্থান। দূর থেকেই চোখে পড়ে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু ফোয়ারা ও আশেপাশের প্রচুর নামীদামী দোকান। তার থেকেও বেশি চোখ কাড়ে ঘাসের রঙবেরং-এর ফুল দিয়ে সাজানো একটি বিশাল গোল ঘড়ি যা কিনা সারাক্ষণই সঠিক টাইম দেখিয়ে যাচ্ছে। দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে রিস্টওয়াচের দাম দেখে ক্ষণেক্ষণেই হোঁচট খেতে লাগলাম। এদেশের গর্ব টেনিসসম্রাট 'রজার ফেডেরার' বড় বড় ছবিতে হাতে রোলেক্স ঘড়ি লাগিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়ে যাচ্ছেন। ভারতের গর্ব ঐশ্বর্য রাইও খুব বেশি পিছিয়ে নেই, তিনিও প্রমাণ সাইজের ছবিতে হাতে লঁজিন ঘড়ি সেঁটে দাঁড়িয়ে আছেন। হাঁটতে হাঁটতে লেকের ফুরফুরে হাওয়ায় পায়ে বেশ ঠান্ডা লাগতে আরম্ভ করলো তাই ভাবলাম রোলেক্স ঘড়ি যখন কপালে নেই তার বদলে একটা মোজাই কিনে নিই একাধারে মেমেন্টোও হবে আবার পা-টাও গরম থাকবে। কাছেই একটি ছোট দোকানে ঢোকার সাথে সাথেই এক স্যুইস মহিলা হাত জোড় করে নমস্তে বলে সম্ভাষণ জানালেন। তিনি নাকি কিছুদিন আগেই মাত্র চারটি শব্দের ওপর ভরসা করে বয়ফ্রেন্ডের সাথে সারা উত্তরভারত ঘুরে এসেছেন। উৎসুক ভাবে তার মুখের দিকে তাকাতেই তিনি বলে উঠলেন শব্দগুলি, যথাক্রমে 'খানা', 'পিনা', 'শোনা ও 'যানা'; ওনাদের নাকি রেষ্টুরেন্ট খোঁজার দরকার হলে হাতটিকে মুখের কাছে তুলে বলতেন খানা, তেষ্টা পেলে পিনা, হোটেল খোঁজার প্রয়োজন হলে শোনা আর দ্রষ্টব্যস্থানের ছবি দেখিয়ে ট্যাক্সিওয়ালাকে বলতেন যানা- ব্যাস তাহলেই কেল্লা ফতে। যে দেশের জাতীয় ভাষাই কুড়িটা। সেখানে চারটি শব্দের জোরে ওনার উত্তরভারত ঘোরার গল্প শুনে এতটাই মুগ্ধ হয়ে গেলাম যে মোজা কেনার কথাটাই বেমালুম ভুলে গেলাম। পুরনো জেনিভার পাথরে বাঁধানো রাস্তার ধারে ধারে দামী ব্যুটিকের দোকান, তাই উইনডো শপিং করেও বেশ খানিকটা সময় কেটে যায়। তবে জিনিষপত্রের যা দাম তাতে শপিংটাকে উইনডোর মধ্যে রাখাই বাঞ্ছনীয়। মনে মনে সব কটি পছন্দসই জিনিসেরই শপিং সেরে পাশেই আটশো বছরের পুরনো 'সেন্ট পিটার' ক্যাথিড্রাল চার্চে ঢুকে পড়লাম। চার্চে ঢুকতে এক নয়া পয়সা খরচা নেই,

তাছাড়া ভেতরের কারুকার্যও বড় সুন্দর। এসব দেশে ধর্মীয় স্থানে আমাদের দেশের মত পান্ডা বা পুরোহিতের অত্যাচার নেই, তাই এই সুন্দর ক্যাথিড্রালটির ভেতরে কিছুক্ষণ বসে মনটা যেন সত্যিই ভরে গেল।

পরের দিন বার্নে ফিরে গিয়ে সেখান থেকে 'থুনারসি' লেকের ধারে 'স্পিয়েজ' বলে একটি জায়গায় পৌঁছলাম। পাহাড় ও স্বচ্ছ লেকের ধারে একটি মধ্যযুগীয় ক্যাসেল যার প্রতিবিম্ব জলে পড়ে মনে হচ্ছিল যেন সত্যিই কোনও শিল্পীর আঁকা ছবি। থুন ও ব্রিয়েনেজ লেকের মধ্যিখানে একটা জায়গার নাম ইন্টারলকেন অর্থাৎ ল্যাটিন ভাষায় তা হল দুটি লেকের মধ্যিখান। এখান থেকে ট্রেন নিয়ে 'ইউলফ্রাও' যেতে হয়। সাড়ে এগারো হাজার ফিট উঁচুতে অবস্থিত এই স্টেশনটিতে নেমে আবার স্পেশাল লিফট নিয়ে পাহাড়ের চূড়োতে উঠতে হয়। বরফের ঝড়ের মধ্যেই আমরা 'আলেটস' গ্লেসিয়ারে নেমে পড়লাম কিন্তু হাওয়ার ঠেলায় বেশিক্ষণ দাঁড়ায় কার সাধ্যি! কোনও কষ্টসাধনা না করে দিব্যি বারো হাজার ফিট উঁচুতে একটি হিমবাহর ওপর দাঁড়িয়ে আছি ভেবে বেশ মজা লাগল। এখানেই রয়েছে স্যুইৎজারল্যান্ডের বিখ্যাত আইস মিউজিয়াম যেখানে বড় বড় গাড়ি থেকে জলহস্তী সবই বরফে তৈরি। মেঝে একেবারে তালমিছরির মত চকচকে, তাই হাঁটতে গিয়ে প্রথমেই একটি সপাটে আছাড় খেলাম কিন্তু পরমুহূর্তেই লোকলজ্জার ভয়ে যেন কিছুই হয়নি এমনধারা ভাব দেখিয়ে হাসি হাসি মুখে উঠে পড়লাম। কোনও কষ্ট না করে হিমবাহের ওপর দিয়ে হাঁটাটা সত্যিই স্মরণীয়। ইন্টারলকেন থেকে ট্রেনে আমাদের শেষ গন্তব্যস্থল লুসার্নে পৌঁছলাম। লুসার্নকে চেনার সব থেকে বড় উপায় হল ষোলশো শতাব্দীতে তৈরি একটি কভার্ড ব্রিজ। এই শহরের মধ্য দিয়ে চলে গেছে 'রিয়স' নদী আর তারই ধারে ধারে সুন্দর সুন্দর পুরনো বাড়ি ও চার্চের সাথে চোখে পড়ে তাদের বিখ্যাত চ্যাপেল ব্রিজ। পরের দিন কেবিল কার নিয়ে মাউন্ট পিলাটাসের মাথায় উঠে চতুর্দিকের বরফে ঢাকা পাহাড় ও দূরে ঘন সবুজ ঘাসের আস্তরণ দেখে মনে হল স্বর্গ বলে যদি কিছু থাকে তা বোধহয় এখানেই। কাশ্মীর আমি গেছি যাকে অনেকেই স্যুইৎজারল্যান্ডের সাথে তুলনা করেন, কিন্তু সেখানকার রাস্তাঘাটের নোংরা, ডাল লেকে শিকারাওয়ালাদের অত্যাচার ও হকার বাদ দিয়ে যদি জায়গাটিকে কল্পনা করতে পারেন তবেই স্যুইৎজারল্যান্ডের স্বাদ কিছুটা পাবেন।

লুসার্ন থেকেই এই রূপকথার দেশটিকে আমাদের বিদায় জানাতে হল,এখান থেকেই ইতালির মিলান শহরে আবার ফিরে যাওয়ার পালা। এটিই বোধহয় আমার দেখা একমাত্র দেশ যেখানে রাস্তাঘাটে একটি হকারের দর্শন মেলেনি, কারণ এ দেশে ঢোকা-বেরোনোর নিয়মকানুন অত্যন্ত কড়া। ইউরোপের মধ্যিখানে বাস করেও কি করে সম্পুর্ণ নিরপেক্ষ থেকে গায়ে একটি আঁচড়ও না লাগিয়ে দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ এরা পার করে দিল তা ভেবে আজও বিস্ময় লাগে। বিশ্বের যত দু-নম্বরী টাকা এখানেই খাটে, অথচ এদের বদনাম করা তো দূরের থাক আমরা স্যুইস প্লেনে চেপে, মুখে স্যুইস চকোলেট পুরে, হাতে দামী স্যুইস ঘড়ি লাগিয়ে অত্যন্ত গর্ব অনুভব করি! থাকুক না থাকুক একবার কথাচ্ছলেও যদি বন্ধুমহলে স্যুইস ব্যাঙ্কের সাথে যোগাযোগটা একটু জানিয়ে দিতে পারেন, তাহলে দেখবেন প্রেস্টিজ একেবারে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে আর ঘরে ঘরে নিমন্ত্রণও সামাল দিয়ে উঠতে পারছেন না। এটাতে আশ্চর্য হবার অবশ্য কিছুই নেই কারণ স্যুইৎজারল্যান্ড হল বিশ্বপ্রকৃতির নিজের হাতে গড়া সেই অসামান্যা বিশ্ব-সুন্দরী মেয়ে যে মিষ্টি হেসে মধুর ব্যবহারে এমন নিঁখুতভাবে নিজেকে লোক সমাজে পরিবেশন করে যে তখন সবকিছু ভুলে আমরা শুধু তার দিকেই তাকিয়ে থাকি, তার কোনও দোষ-ত্রুটিই আমাদের চোখে পড়েনা। স্যুইৎজারল্যান্ডের চোখ-ধাঁধানো প্রাকৃতিক দৃশ্যের সাথে যোগ হয়েছে সেখানকার মানুষদের নিয়মানুবর্তিতা, মিষ্টি ব্যাবহার ও অসাধারণ সৌন্দর্যবোধ।

সব শেষে জানিয়ে রাখি স্বর্গ-নরকে বিশ্বাস করুন অথবা না করুন ছোটবেলা থেকে স্বর্গের যে ডেস্ক্রিপশান পূর্বপুরুষরা আমাদের মাথায় গেঁথে দিয়েছেন তার সাথে এই দেশটির কিন্তু বিলক্ষণ মিল আছে। তাই সম্ভব হলে জীবিত অবস্থাতেই একবার স্বর্গদর্শন করে আসুন না, ভয় নেই ভালো না লাগলে রিটার্ন টিকিট কাটার সুযোগ আছে, অন্যটা কিন্তু শুধুই ওয়ান ওয়ে।

~ *স্যুইৎজারল্যান্ডের আরও ছবি* ~

শ্রাবণী ব্যানার্জীর জন্ম ও বেড়ে ওঠা কলকাতায়। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির বাসিন্দা। বাংলা সাহিত্যের পাশাপাশি সঙ্গীতচর্চা ও ইতিহাস পাঠে জড়িয়ে আছে ভালবাসা। কৌতূহল এবং আনন্দের টানেই গত কুড়ি বছর ধরে বিশ্বের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত করে বেড়াচ্ছেন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

কেমন লাগল : - select -

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly , please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory .

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com

© 2011 - AmaderChhuti.com • W eb Design: Madhuwanti Basu

Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

ইন্দোনেশিয়ার ডায়েরি

দেবলীনা দাস

~ ইন্দোনেশিয়ার আরও ছবি ~ বালির আরও ছবি ~

ইন্দোনেশিয়া বললেই লোকজনের মাথায় সর্বপ্রথম আসে বালির কথা। কিন্তু আমাদের ইন্দোনেশিয়া ভ্রমণ শুরু হয়েছিল জোগজাকার্তা থেকে, ছোট্ট আদরের নাম যার জোগজা। বেয়াড়া টাইমের ফ্লাইটে উড়ে প্রথমে কুয়ালালামপুর, ন' ঘন্টা পরে সেখান থেকে জোগজা। কুয়ালালামপুর থেকে সঙ্গে পেয়েছি বন্ধু অনির্বাণ ও ক্যামেলিয়াকে, আর তাদের পুঁচকে ঋক, আমার ঋষির চেয়ে মাস ছয়েক যে বড়। অনেকটা জার্নি সে ঘুমিয়ে কাটিয়েছে, আর আমারটি দিয়েছে এয়ারপোর্টময় গড়াগড়ি।

১. জোগজাকার্তা

জোগজা পৌঁছে ট্যাক্সি পেতে বেশ অনেকটা সময় লেগে গেল। ট্যাক্সি বা রাস্তায় চলা গাড়িগুলি সব-ই ঝকঝকে, বেশির ভাগের কাঁচ কালো। ছোট শহর, ছোট ছোট রাস্তা। ইন্দোনেশিয়ানরা গাড়ি চালান ধীরেসুস্থে, স্পিড লিমিট অক্ষরে অক্ষরে মেনে। জানা গেল আমাদের ড্রাইভারের নাম হুডি। তার সঙ্গে কথা বলা হল পরের দিন দুপুরে প্রম্বানন মন্দির ও রাতু বোকো যাওয়ার জন্য। এইখানে বলি, ভারতীয় এক টাকায় মোটামুটি দুশো ইন্দোনেশিয়ান রুপিয়া বা আই ডি আর পাওয়া যায়। অতএব আমাদের হিসেবপত্র, কথাবার্তা হচ্ছিল লাখে কোটিতে। "তোর কাছে কত আছে রে?" "এই পাঁচ লাখ মত আছে।" আমি অঙ্কে কাঁচা, হাল ছেড়ে দিলাম প্রথম দিন-ই।

প্রাসাদোপম হোটেল, কিন্তু সব চেয়ে মুগ্ধ করল লোকজনের ব্যবহার। সদাহাস্যময়। আমাদের ছেলেদু'টির দুষ্টুমিতেও বিরক্তি নেই, এমনকী রাতে ডাইনিং হলে বমি করল আমারটি, আমরা যারপরনাই লজ্জিত, ওঁরা অম্লানবদনে পরিষ্কার করলেন।

এখানে একটু খাওয়ার গল্প করি। ডিনারে প্রথম পরিচয় এ দেশে সর্বত্র বিরাজমান ফ্রাইড রাইসটির সঙ্গে, নাম তার নাসি গোরেং। নাসি মানে ভাত। প্লেটে সাজানো আসে, অল্প সবজি দেওয়া সুস্বাদু ভাত, পাশে একটি কাঠিতে গাঁথা মুরগির মাংসের কাবাব জাতীয় টুকরো, ওপরে মাখানো মিষ্টি মিষ্টি একরকম সস - নাম শিক্ষা পর দিন রাস্তার ধার থেকে কিনে খেতে গিয়ে, সাতে আয়াম, আয়াম অর্থ মুরগির মাংস, একটি ভাজা ডিমের পোচ, স্যালাড, কিমচির মত ভিনিগারে ভেজানো কুচো স্যালাড, ও চিংড়ির পাঁপড়। আমরা বেশির ভাগ এই খেয়ে ছিলাম অথবা এর নুডলস ভাই মি গোরেং। রাইস নুডলসতও দেখেছি ব্রেকফাস্টে, বিহুন গোরেং নাম তার। ব্রেকফাস্টে পর দিন দেখলাম আমিষের প্রাধান্য। ইউরোপীয় ও জাভানিজ দু'রকম খাবারই ছিল, দেখলাম জাভানিজ খাবারে সকালেও মুরগি, চিংড়ির পাঁপড় ইত্যাদি। অনির্বাণদের বাড়ি থেকে আনা প্রেসার কুকারে পুঁচকেদের খিচুড়ি ফুটিয়ে নেওয়া হল হোটেলে। সে আরেক মজার গল্প, প্রেসার কুকার কখনো দেখেনি কেউ, সিটি পড়তেই অতএব হুলুস্থুল কান্ড কিচেনে, তাদের বোঝাতে হল যে ওরকম বিদঘুটে আওয়াজ আরও হবে।

বাচ্চাকাচ্চা সামলে বেরোতে লেট, দেখা গেল রাতু বোকো, যেখানে সূর্যাস্ত দেখতে যায় সবাই, সেখানে যাওয়ার আর সময় হবে না। যাওয়ার পথে অঝোর বর্ষণ, কী ভাগ্য থেমে গেল নামার কিছু আগেই, ওদিকে বৃষ্টি হলে কাদাও জুটত কপালে। প্রবেশমূল্য আছে সব জায়গায়, এমনকী ধানের ক্ষেত দেখতে গেলেও, এবং সেটা বেশ কষ্টকর রকম বেশি, কচিগুলোও ছাড়ান পেল না। তবে প্রম্বানন দেখে মন ভরে গেল। মেঘলা আকাশের গায়ে কালো পাথরের বিশাল তিনটি মন্দির ত্রিদেবের, আশেপাশে ছোট্ট মন্দির আরও দু'শোর ওপর, কিছু ভেঙে পড়া, কিছু আস্ত। ইন্দোনেশিয়ায় সব দর্শনীয় মন্দিরের চার দিক ঘিরে বিশাল বাগান, গাছ, প্রম্বাননে বাচ্চাদের খেলার ব্যবস্থাও, চাইলে গোটা দিন ঘোরা যায়। গাইড পেলাম এক বয়স্ক মানুষকে, সুন্দর ভাবে বোঝালেন যে ইন্দোনেশিয়ায় এখন মুসলমানরা সংখ্যাগুরু হলেও অন্য ধর্মের সঙ্গে তাঁদের কোনো বিবাদ নেই, হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরগুলিকে তাঁরা জাতীয় সম্পদ বলে রক্ষা করেন। জানা গেল হিন্দুরা বালির দিকে সংখ্যায় বেশি।

ব্রহ্মার মন্দিরটি মেরামতির কারণে বন্ধ ছিল, সেটি ছাড়া যা দেখার ছিল সব-ই দেখলাম। উঁচু খাড়াই সিঁড়ি বেয়ে উঠে অন্ধকারের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেবমূর্তি দেখতে হয়, কিছু জায়গায় গাইডরা টর্চ জ্বালান। আমার পুত্র ভয় পেয়ে কাঁদতে আরম্ভ করল, অতএব তার বাবা তাকে নিয়ে নেমে গেল নীচে। চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি দেখলাম, তারপর অষ্টভূজা দুর্গা, বিশাল গণেশ। সব চেয়ে ভাল লাগল মন্দিরের গায়ে খোদাই ছবি, আংকোরভাটের কথা মনে পড়ে গেল, অনেকটাই মিল। দশ দিকপালের মূর্তিগুলি সুন্দর, আর রামায়ণের গল্প। গরুড় ও রাবণের যুদ্ধ আর বালি ও সুগ্রীবের লড়াই এবং তার পরে সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেকের কথা বিশেষ করে বলতেই হয়।

পরদিন বরোবুদুর বৌদ্ধস্তূপ দেখতে গেলাম সকালে। আজকের ড্রাইভার নাকি হুডির ভাই, নাম ইশতিয়াক। তার ছেলের নাম নাকি যুধিষ্ঠির। সে যাক, পৌঁছে পেলাম কড়া রোদ, ঋষির টুপি কেনা হল নাছোড়বান্দা হকারদের কাছ থেকে। প্রবেশমূল্য দিলে প্রত্যেকের জন্য একটি করে জলের বোতল ফ্রি, এটা গত কালকেই ক্যামেলিয়ার আবিষ্কার প্রস্থাননে। নিয়ে হাঁটা, বিশাল বাগানের মধ্যে দিয়ে, গাছপালার আধিক্যেও ঘাম কিছু কম হল না। আবার সিঁড়ি, হিন্দু, বৌদ্ধ এই সব অর্চনাস্থলগুলি মেরু পর্বতকে মাথায় রেখে তৈরি কিনা। আর ভগবানের কাছে পৌঁছনো, সে কি করে সহজ কাজ হয়। ঋষি অনেকটাই নিজে নিজে উঠল, তবে একদম ওপর পর্যন্ত আমি আর ও যাইনি, নিচে অপেক্ষা করলাম বাকিদের সঙ্গে, খাড়া সিঁড়ি বেয়ে গেল ঋষির বাবা। দেওয়ালের গায়ে আঁকা কতরকম পশুপাখি, বাণিজ্যপোত, আমার সদ্য জীবজন্তু চিনতে শেখা খুদেটি আপ্লুত। পরিসরের মধ্যে হাতি আর ঘোড়ার গাড়ি চড়ার ব্যবস্থা আছে, আমরা চড়িনি, কিন্তু ঋষির দেখেই আনন্দ। হকাররা শেষের দিকটায় তাড়া করতে বাকি রাখেন, আমার স্বামী অনিমেষ এড়াতে না পেরে কটি পুতুল কিনল। এরকম সব দর্শনীয় স্থল থেকে বেরোতে হয় হকার বাজারের মধ্যে দিয়ে, রাস্তা সেভাবেই তৈরি। পারলে বাঁচান নিজেকে!

এরপর সাড়ে তিন ঘন্টা বিশাল পথ পার করে ডিয়েং মালভূমি, সেখানে আছে একটি আগ্নেয়গিরির মুখ, ধোঁয়া উদ্গীরণ করছে অনবরত, মুখে জল ফুটছে টগবগ। আশেপাশের মাটি গন্ধকে হলদেটে, দুএকটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। ওপর থেকে দেখলাম একটি হ্রদ, সুন্দর, বিশাল, কিন্তু ততক্ষণে এত ক্লান্ত, বস্তা ফেলা মাটির সিঁড়ি দিয়ে নামতে পারতাম না যদি আমাদের গাইড ছেলেটি না ধরত। পঞ্চপান্ডবের মন্দিরের কাছে পৌঁছে ঋষি ঢলে পড়ল ঘুমে, আমরা গাড়িতে বসে রইলাম তাই। কিন্তু ক্যামেলিয়ারা ফিরে এসে বলল উপেক্ষিত শিখন্ডীরও একটি মন্দির আছে ওখানে। ভাল লাগল, শিখন্ডীকে কেউ তো রেখেছে মনে।

পরের দিন রাতের ফ্লাইট সুরাবায়া যাওয়ার। দিনের বেলা কী করা যায় তাহলে? হোটেলের রুম ছেড়ে ক্লোকরুমে জিনিস রেখে বেরিয়ে পড়লাম গেম্বিরা লোকা জু দেখতে। শিশুদু'টো কিছু আনন্দ পাক, মন্দির হ্রদ ওরা কী বোঝে। কথাপ্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি, ততক্ষণে কী যেন অজানা কারণে ঋক আমাকে ভালোবেসে ফেলেছে, মিমি বলে ডাকছে আমায়। কোলে উঠতে চাইছে, কিন্তু ঋষির তাতে প্রবল আপত্তি। সে যা হোক, চিড়িয়াখানায় দেখলাম টয় ট্রেন চলে, গোটা দিনের টিকিট নিলে তাতে চড়ে যেখানে ইচ্ছে যতবার ইচ্ছে যাওয়া যায়। বোটিংও করা যায়। অতএব ঘুরে ঘুরে বাঘ, হাতি, শিম্পাজি, সাপ দেখলাম। স্নেক পার্কে প্রচুর সাপ, ছবি তোলানো যায় বাছা বাছা সাপের সঙ্গে, আর পাখিদের জায়গাটি খুব সুন্দর সাজানো। ময়ূরকে পেখম তুলতে দেখলাম, আর ব্ল্যাক সোয়ান। বাচ্চাদের সাথে সাথে আমাদেরও মন ভরে গেল।

২. সুরাবায়া

রাতের ফ্লাইটে সুরাবায়া। শ্রীবিজয়া এয়ারলাইন্সের প্লেন মধ্যপথে নাচ দেখালো। ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম সবাই, ভেবেছিলাম এ যাত্রা এখানেই শেষ। ট্যাক্সি ধরে ঝাঁ চকচকে নতুন হোটেল আলানা। খাবারের দাম কিছু বেশি, আর জোগজার হোটেলে খাবার যেন বেশি ভাল ছিল মনে হল।

সুরাবায়া আসা মাউন্ট ব্রোমোর জন্য, ইন্দোনেশিয়ার একশো সত্তর না তিয়াত্তরটি সক্রিয় আগ্নেয়গিরির মধ্যে একটি। অপূর্ব তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য। কিন্তু পৌঁছে এদিক ওদিক খবর নিয়ে জানা গেল, যাওয়া সম্ভব নয়। তিন চার ঘন্টার কার জার্নি, তারপর বেশ কিছুটা চড়াই হেঁটে ওঠা, তারপর মরুভূমির মধ্যে দিয়ে হাঁটা, আবার সে ভাবতেই ফিরে আসা। ছেলেদের কোলে তুলে অসম্ভব। তার ওপর ওদের অসুস্থ হয়ে পড়ার ভয়। আর খরচ শুনেও মধ্যবিত্ত মাথা ঘুরে গেল, ভারতীয় টাকায় পঁচিশ হাজার আনুমানিক, তারপর খাওয়াদাওয়ার খরচ আছে। অতএব ব্রোমো বাতিল। তার বদলে কী করা যায় তাহলে? খুঁজে খুঁজে কিছু দূরে প্রিগেন বলে একটি গ্রামে তমন সাফারি পার্ক যাওয়া হবে ঠিক করা হল, আর রাতে একটি নাইট কার্নিভাল কাম এমিউজমেন্ট পার্ক। রাতে ঋষির জ্বর এল, বুঝতে দেরি হওয়ায় ওষুধ পড়ল সকালে। যখন বেরোলাম ট্যাক্সি ধরে তখনও গা গরম, ভাল কাশি। ব্রোমো যাওয়া হয়নি ভালোই হয়েছে মনে হল। বয়স্ক ট্যাক্সিওয়ালার সঙ্গে প্রিগেন পৌঁছলাম, সেখানে ছেলেদের খিচুড়ি খাইয়ে চড়ে বসলাম বাসে।

ব্যাঙ্গালোরের বানেরঘাট্টার মত সাফারি, কিন্তু জীবজন্তু অনেক অনেক বেশি। এক একটি মহাদেশের জন্য এক একটি জায়গা বরাদ্দ, বাস থেকে গ্রিজলি ভালুক, সুমাত্রান বাঘ, সিংহ, জিরাফ, জেব্রা কি না দেখা হল! সাফারি শেষ হওয়ার পর চিল্ড্রেন্স জু দেখলাম ঘুরে, ঋষির দেখলাম শজারুদের ভারি ভাল লেগেছে। এখানেই ঋষির প্রথম আর শেষ বায়না, স্যুভেনির শপ থেকে একটা হাতিমুখো টুপি, তার ল্যাজ আর চার হাত পা ও আছে। সেটা কিনে মাথায় পরে তবে শান্তি। ফেরার পথে কেএফসি থেকে কিনে গাড়ির মধ্যে খেয়ে পেট ভরালাম। হোটেলে একটু বিশ্রাম নিয়ে ট্যাক্সি ধরে সুরোবোয়ো নাইট কার্নিভাল। সে ভারি মজার জায়গা, বিকেলে তিনটে থেকে রাত এগারোটা অবধি খোলা থাকে। দু'টো ই-বাইক নিয়ে বাচ্চাদের বাবারা তাদের নিয়ে টুকটুক করে ঘুরল। মজার সব রাইডস, বাচ্চারা একা চড়তে পারে এমনও বেশ কিছু জিনিস। একটা ওয়্যাক্স মিউজিয়াম কাম ট্রিক ফটোগ্রাফির জায়গা, সেলফি আর এমনি ছবি তোলার জন্য আদর্শ। আমাদের মেলার মত টিপ করে মেরে জিনিস জেতার খেলাও ছিল। ফিরলাম রাত করে, ঋষি ঘুমিয়ে পড়ল কোলে। রাতে জ্বরের ওষুধ খেতে গিয়ে বমি করে সে এক কান্ড। বহু কষ্টে ভুলিয়েভালিয়ে

একটু ওষুধ গেল পেটে। সকালে ঘুমোতে দিলাম, ব্রেকফাস্টে আমি আর যাইনি, অনিমেষ এক প্লেট খাবার নিয়ে এল। কোনো রকমে খেয়ে, ছেলেকে তুলে বাবা বাছা করে খাবার, ওষুধ খাওয়ালাম। এবার গন্তব্য ডেনপাসার, বালি। আবার ফ্লাইট, এবার লায়ন এয়ার। এয়ারপোর্টের ভেতর ঢুকে আবার বমি খাবার খেতে গিয়ে। আমার তখন বেড়ানোর শখ মিটে গেছে, কাঁদতে শুধু বাকি। মনে হচ্ছে ছেলে নিয়ে বাড়ি ফিরি কোনও রকমে।

৩. বালি

বালি যাওয়ার সময়ে প্লেন গেল সমুদ্রের ওপর দিয়ে। ঝিকিয়ে ওঠা জল, ছোট্ট ছোট্ট দ্বীপ দেখা গেল। এয়ারপোর্ট সমুদ্রের গায়ে, নামার সময়ের সে দৃশ্য ভোলা যাবে না কখনও। তেমনই সাজানো এয়ারপোর্টটি, হয়তো ট্যুরিস্ট বেশি আসে বলেই। বেরিয়ে ট্যাক্সি ধরে হোটেল হ্যারিস সেমিনিয়াক। আগের দু'টি হোটেলের পর এখানে রুমগুলো নেহাত পাতি মনে হল, লোকজনের মধ্যেও আন্তরিকতার অভাব। দুপুরে হোটেলে খেয়ে রাতে বেরোনো হল একটু, সেমিনিয়াক স্কোয়ারে একটু ওষুধ কিনে ইতিউতি হেঁটে গেলাম কুইন্স তন্দুর, ভারতীয় খাবার কিনতে। বসে খাওয়ার জায়গা জুটল না, তাই কিনে হোটেল ফেরত।

সেদিনের প্রথম গন্তব্য ছিল তীর্থ এম্পুল, একটি উষ্ণ প্রস্রবণকে কেন্দ্র করে সুন্দর একটি মন্দির। নিত্যপূজার্চনা হয়, অত ভেতর অবধি পর্যটকদের যাওয়া বারণ। সারং না পরে ভেতরে ঢোকা যায় না, সে আপনার পোশাক যতই গা ঢাকা হোক না কেন। আংকোরভাটে চুড়িদারে চলেছে, এখানে ফ্রি পাওয়া যায় সারং, গায়ে জড়িয়ে চুল বেঁধে নিতে হল, ক্যামেলিয়ার থেকে ক্লিপ নিলাম ধার।

এর পর দেখতে গেলাম ছোট্ট একটি জলপ্রপাত, তার নাম জানা নেই। এখানেও প্রবেশমূল্য! গেলাম আমরা তিন জন, আর ঋক, ঘুমন্ত ঋষিকে নিয়ে গাড়িতে থাকল তার বাবা। নিচ অবধি যাওয়া যেত, কিন্তু প্রচুর সিঁড়ি, যদি বা নামা যেত, ওঠা রোদের মধ্যে কষ্টকর হয়ে যেত। তাই একটু ছবি তুলেই ফিরে এলাম। ফেরার পথে রাস্তার মুখে অনির্বাণরা কিনল বিশাল এক ডাব, আমাদের টাকায় তার একশো টাকা দাম, কিন্তু তার শাঁস আর জল খাওয়া গেল চার জন মিলে।

হা হা হি হি করতে করতে এবার কিন্তামণি, নামটি মনে হয় চিন্তামণির ইন্দোনেশিয়ান রূপ। ওপরে ভিউপয়েন্ট থেকে একটি আগ্নেয়গিরির মুখ আর পাশের বিশাল লেক দেখা যায়, কিছুটা তার কুয়াশা ঢাকা, কিছুটা ঝিকিয়ে ওঠে রোদ পড়ে। ঋষি জেগেছে তখন, তাকে খাইয়ে নিলাম একটি শপিং কমপ্লেক্সের সিঁড়িতে বসে, পাশে স্থানীয় হকার মহিলা এক হাজার ভারতীয় টাকায় দশটি টিশার্ট বেচবেন বলে সে কী ঝুলোঝুলি।

এখান থেকে এবার গেলাম ধানক্ষেত দেখতে। আসলে টেরেস ফার্মিং বা স্টেপ ফার্মিং যাকে বলে। রাস্তার ধারে, ধাপে ধাপে নেমে যাওয়া যায়, বিশাল তার বিস্তৃতি। কিন্তু সবুজে শুকনো ভাব, প্রাণের অভাব, হয়তো বৃষ্টি হয়নি কিছু দিন। আমরা নিচে নামিনি, কিন্তু সেই প্রবেশমূল্য, গুনতেই হল। খিদে পেয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ওদিকে দোকানপাট তিনটের সময় বন্ধ, তাই এগোলাম উবুদ মাঙ্কি ফরেস্টের দিকে। সার্থকনামা জায়গা মানতেই হবে, গাড়ি থেকে নামার আগেই গাদা গাদা গোদা বাঁদর। খেলছে খাচ্ছে বিশাল বট গাছের ঝুরি ধরে ঝুলছে। টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকে আরও অনেকে তারা, মা বাবা দুষ্টু বাচ্চা, আমি প্রায় রামনাম জপতে জপতে দুরুদুরু বুকে এগোচ্ছি, হাত পা ধরে না টানে তো বাঁচি। কেউ আমার দিকে আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখলেই অনুনয়ের সুরে বলি, "না বাবা, আমার কাছে খাবার নেই বাবা, অন্য দিকে যা!" ওপর থেকে প্রথমে নামলাম নিচের দিকে, একটি ড্রাগনমুখো ব্রিজ ধরে। চতুর্দিকে প্রাচীন সব গাছ, বটের ঝুরি আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরে আছে শ্যাওলা ধরা পাথরকে, ব্রিজের নিচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটি জলের ধারা, বাইরের রোদ এখানে হারিয়ে গেছে সবজে, ভেজা, এক অন্য দুনিয়ার আলোকে রাস্তা ছেড়ে দিয়ে। চারপাশে মুখ ব্যাদান করা কপি মহাকপিদের মূর্তি, আর দলে দলে বাঁদর, গা ছমছম করে উঠছিল। অনিমেষের দৃঢ় বিশ্বাস, তুমি বাঁদরের পেছনে কাঠি না করলে সেও তোমার পেছনে কাঠি করবে না। আমি সে মতে বিশ্বাসী ছিলাম না কোনোদিনই। একটি বাঁদরকে বিনা কারণে এক বিদেশিনীর পা জড়িয়ে ধরতে দেখে বাঁদরজাতির ওপর আর কোনও ভরসা রইল না। পূজাস্থলে ঢোকা নিষেধ, তাই আরেকটি ব্রিজ পার করে উঠে গেলাম ওপরের দিকে যেখানে আরেকটি মন্দির আছে। এই ব্রিজের পাশে বিশালকায় কোমোডো ড্রাগনের মূর্তি, সে যেন জীবন্ত, এক্ষুনি নড়ে উঠবে। মন্দির চত্বরে আবার এক কপিপ্রবর কে দেখলাম এক পর্যটকের ঘাড়ে চড়ে বসতে, আমি তো পালাতে পারলে বাঁচি। না হোক কয়েক হাজার বাঁদরের বাস সেখানে, দলে তো ওরাই ভারি। মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে খানিক গিয়ে একটা ছোট্ট জলের কুণ্ড পেলাম, তাকে ঘিরে জলপানরত জীবজন্তুদের মূর্তি। কুর্ণিশ করতেই হয় সেই অজানা কারিগরকে, যার হাতের তৈরি বাঘের মূর্তি আজও ঘাড়ে লাফ দিয়ে পড়বে মনে হয়। সেখান থেকে সামনে উঠে গেলে বালিনিজ হিন্দুদের একটি শ্মশানভূমি, দেখা হল না কারণ বড্ডই খিদে পেয়েছিল। প্রসঙ্গত: জানাই, ওয়াহানের কাছে শুনেছিলাম বালির হিন্দুদের মৃতদেহকে প্রথমে কবর দেওয়া হয়, পরে প্রতি পাঁচ বছরে কবরস্থানের সব শবদেহকে এক সঙ্গে তুলে পোড়ানো হয়। শবদাহ বেশ খরচসাপেক্ষ ব্যাপার, তাই এই অভিনব পন্থা অবলম্বন। এখানে একটি বোর্ডে দেখলাম সেই কথাই লেখা আছে।

অত:পর রয়্যাল প্যালেসের কাছে কুইন্স তন্দুরে পেট ভরে বিরিয়ানি খেয়ে হোটেল। ঋষি একটু গাজরের হালুয়া খেল, কিন্তু পথেই সেটা ঘুমের

মধ্যে কেশে বমি করে তুলে দিল। পথে দাঁড়িয়েছিলাম ছেলেদের খাওয়ার সব্জি খুঁজতে, একটা বড় সুপারমার্কেটে আলু, ক্যাপসিকাম আর বিনস পেলাম, বিশাল প্রাপ্তি বটেই, কারণ ইন্দোনেশিয়ায় সন্ধেবেলা ফলমূল পাবেন, সব্জি নয়, কিনতে চাইলে সকাল ন'টার আগে।

সেদিন রাত থেকে ঋকের জ্বর, নাক বন্ধ। আমাদের কাছ থেকে নাকের ড্রপ দেওয়া হল। সকালে দেখা গেল বিশল্যকরণী সেই হোমিওপ্যাথিক ওষুধে ঋষির কাশি কিছুটা কম, অতএব ঋককেও সেটা খানিক গলাধ:করণ করানো হল। সেদিন প্রথম গেলাম তমন আয়ু, রয়্যাল টেম্পল এবং বাগানবাড়ি। ট্র্যাডিশনাল বালিনিজ স্থাপত্য, খুব সুন্দর লাগল। পূজাস্থলে ঢোকা বারণ, বাইরে থেকে উঁকি মেরে দেখলাম। লাগোয়া বাগানটি বিশাল, অসুস্থ বাচ্চাদের নিয়ে রোদের মধ্যে সবটা ঘুরে দেখা হল না।

এর পর উলুন ডানু, ডানু অর্থে লেক। এখানে বিশাল একটি লেকের ওপরে ফুলগাছে ঘেরা অপূর্ব একটি মন্দির, পূজার্থীরা যেতে পারেন। চার ধারে বিশাল বাগান, তার মধ্যে রেস্টুরেন্ট, মায় বাচ্চাদের খেলার জায়গা অবধি। ঋষিকে দোলনা থেকে নামাতে প্রাণ যায় যায়। ভারি রেগে গেল ছেলে, মেজাজ ঠিক হল অনেক পরে। দেওয়াল পেরিয়ে বাগানের দ্বিতীয় ভাগ, একদম লেকের কিনারায় একটি ছোট্ট দ্বীপে যাওয়া গেল। মন ভরে গেল মুক্ত প্রকৃতির বুকে এসে। বেরিয়ে আসার সময়ে আমার ছেলের সঙ্গে আলাপ দুই জাপানী তরুণীর, তাঁরা নাছোড়বান্দা, ওর সঙ্গে ছবি তুলেই ছাড়বেন, অমন মিষ্টি ছেলে ওনারা জীবনে দেখেননি। এরকম এক ইন্দোনেশিয়ান মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সুরাবায়া আসার পথে, ইচ্ছে হচ্ছিল বিচ্ছুটাকে দু'দিন সামলাতে বলি, তারপর দেখব কত মিষ্টি লাগে!

এবার টুইন লেকস দেখতে যাত্রা। আকাশের মুখ ভার দেখলাম, ভয় হচ্ছিল বৃষ্টি শুরু হলে নামা যাবে না আর। লেক দুটিকে যেতে যেতেই পাশে দেখতে পেলাম, বিশাল চেহারা তাদের। ভিউপয়েন্ট থেকে দেখা গেল মাঝে একটি পাহাড় ব্যবধান তৈরি করেছে, দুপাশে লেক বুয়ান ও লেক তাম্বলিঙ্গান, একটি ছোট একটি বড়। একটু দাঁড়াতে না দাঁড়াতে কুয়াশায় ঢেকে গেল সব, বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি এসে নামল। ফেরার পথে ওয়াহান জানাল এখানেই তার দেশবাড়ি, পরে বাবা শহরের দিকে চলে গেছেন। কাকার বাড়ি দেখাল, কৃষক তিনি, গাড়ি দাঁড় করালেই নাকি গাড়িতে তুলে দেবেন চাষের ফসল, মায় হাঁসমুরগি। ওখানে শুনলাম বেশ ঠান্ডা পড়ে রাতে, ভোরের দিকে চার-পাঁচ ডিগ্রিতে নেমে যায়।

এর পর গেলাম তানাহ লট। সমুদ্রের বুকে মন্দির, বিখ্যাত সানসেট পয়েন্ট, যাঁরা যাননি তাঁরাও ছবিতে চিনবেন। ঢোকার আগে খেয়ে নিলাম পাশের রেস্টুরেন্টে, সমুদ্রের মুখোমুখি হয়ে বসে। স্যুপের পর আমি নিলাম স্ন্যাপার স্টেক, কেউ চিকেন স্টেক, কেউ নাসি গোরেং, সবশেষে দৈত্যাকৃতি ডাব। মন্দিরের কাছে পৌঁছনোর আগেই সুয্যিমামা পাটে গেলেন আকাশময় লালিমা মাখিয়ে। তারপর ক্রমশ আঁধার হয়ে আসা আকাশের ব্যাকগ্রাউন্ডে সমুদ্রের বুকে পাহাড় কেটে দাঁড় করানো সেই মন্দির, ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয় এখনও। ওপরে ওঠা যায় না, কিন্তু পুরোহিতদের বসে থাকতে দেখলাম ওপরের চাতালে। একটা গুহার সামনে বেশ ভিড়, পবিত্র জল বোতলবন্দি করার জন্য। অনেক ভারতীয়, কিছু বাঙালিও দেখলাম। ফিরে আসার পথের ধারে ঘাসের ওপর ছেলেরা খেলল। বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেছিল দু'টির, সেই দুজনের হাত ধরে হাঁটার বায়না বড় মনে পড়ে এখনও।

পরের দিনও বেরোনো যেত ট্যাক্সি নিয়ে, কিন্তু তার পরদিন ফিরছি। আমরা কুয়ালালামপুর হয়ে ব্যাঙ্গালোর, গোটা দিন লেগে যাবে, আর ক্যামেলিয়ারা কুয়ালালামপুরে এক দিন থেকে ফিরবে। ঋকের শরীর খারাপ, ঘড়ি ধরে ওষুধ পড়ছে। অতএব ভাবলাম পর দিন আরাম করব। পাশেই সেমিনিয়াক বিচে গেলাম। ঋকের জল ভারি পছন্দ, বাবা মা সুইমিং পুল দেখলেই ভয় পায় ঝাঁপ দিয়ে পড়বে। আমারটা আবার পায়ে সমুদ্রের জল, ভেজা বালি লাগলেই 'নুঙ্গা, নুঙ্গা' ('নোংরা, নোংরা') বলে চেঁচায়। জুতো খুলতে চায় না, না আমাদের খুলতে দেয়, ভারি চিন্তা বুঝি

বাবা মায়ের বহুমূল্য হাওয়াই চটি চুরি হয়ে যাবে। সেখান থেকে স্যুভেনির শপ গেলাম, নাম জেনে নিয়েছিলাম ওয়াহানের কাছ থেকেই, কৃষ্ণ তার নাম। সুবিশাল দোকান, হরেক রকম দামের স্যুভেনির। টুকটাক কিনলাম অনেক, তবে ঋষির বগলদাবা করা কাঠের খেলনাগুলো সুবিধের হল না, বাড়ি ফিরেই তাদের টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলল। রাতের ডিনার সারলাম সেমিনিয়াক স্কোয়ারের কাছে জাপানী ফাইন ডাইনিং রেস্টুরেন্ট কুনিস-এ। আমি ইয়াকিসোবা বলে যেটা খেলাম সে কলকাতা ফুটের চিকেন চাউমিন যেন। নিন্দে করছি না, ভালোবেসে বলছি, সত্যি-ই ভাল খেলাম। ঋষি নুডলস কে মুনেল বলে, সে ভাগ বসাল আমার পাতে। অনিমেষ নিল ওয়াকোটোজি বলে একটা ডিশ। সেও বেশ খেতে। পরে মনে পড়ল ব্যাঙ্গালোরে 'দি এগ ফ্যাক্টরি' র মজার মেনু তে পড়েছি, জাপানী ওয়া মানে বোধ হয় পেরেন্ট, আর কো মানে চাইল্ড, অর্থাৎ 'ওয়াকো' মানে এমন একটি ডিশ যাতে পেরেন্ট মুরগি ও চাইল্ড ডিমকে এক সাথে পাওয়া যাবে। রেস্টুরেন্টের লোকজন আমরা চপস্টিক দিয়ে খেতে পারি না আর সব জাপানী খাবারকে সন্দেহের চোখে দেখি বলে হেসে কুটিপাটি, আমরা লজ্জায় অর্ধেক লাল।

পরদিন বিদ্রোহী ঋষি আর অসুস্থ ঋককে কোনো রকমে টেনে এনে ফেলা গেল কুয়ালালামপুরে। সেখানেই দুই পরিবারের ছাড়াছাড়ি, ঋককে খুব মিস করেছি পরের ক'দিন। এত দিন এক সঙ্গে থেকে একটা অন্য রকম সখ্যতা তৈরি হয়েছিল, আর ঋকের জন্য আনা চাল-ডাল-সব্জিতে যে আমার ঋষির ও 'টেস্টি' (খিচুড়ি) তৈরি হয়েছে সে কথা তো ভোলার নয়। তা ছাড়া ওদের কাছ থেকে ছেলের খাওয়াদাওয়া সংক্রান্ত কিছু শিখেছি যা কাজে লাগছে এখন। ন' দিনের ট্রিপ, ওরা না থাকলে ছেলে নিয়ে কক্ষনো পারতাম না। রাত বারোটার পর এসে ব্যাঙ্গালোরে বাড়ি ঢুকলাম, শেষ হল ঋষিকে নিয়ে প্রথম ইন্টারন্যাশনাল ট্রিপ! দুগগা দুগগা!!

~ *ইন্দোনেশিয়ার আরও ছবি* ~ *বালির আরও ছবি* ~

ইংরাজি সাহিত্যের ছাত্রী, বইপোকা দেবলীনা দাসের টুকটাক লেখালিখির শখ আছে। তিন বছরের খুদের মা। আট বছর শিক্ষকতা করার পর এখন দিন কাটে ছেলেকে নিয়েই। জীবনসঙ্গীর ছোঁয়াচ লেগে ভ্রমণপিপাসু। মাঝে মাঝেই বেরিয়ে পড়েন সপরিবারে এদিকওদিক।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00
Like Be the first of your friends to like this.
tell a Friend

বেড়ানোর ভাল লাগার মুহূর্তগুলো সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে ইচ্ছে করে, অথচ দীর্ঘ ভ্রমণ কাহিনি লেখার সময় নেই? বেড়িয়ে এসে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো যেমনভাবে গল্প করে বলেন কাছের মানুষদের - ঠিক তেমনি করেই সেই কথাগুলো ছোট্ট করে লিখে পাঠিয়ে দিন ছুটির আড্ডায়। লেখা পাঠানোর জন্য দেখুন এখানে। লেখা পাঠাতে কোনরকম অসুবিধা হলে ই-মেল করুন - admin@amaderchhuti.com অথবা amaderchhuti@gmail.com -এ।

বর্ষায় কৈখালি

দীপাঞ্জনা দত্ত বিশ্বাস

বর্ষায় ঘুরতে যাওয়ার একটা বিপদ থেকেই যায় - এই বুঝি ঝেঁপে বৃষ্টি নেমে ঘোরাটাই পন্ড করে দিল। কিন্তু মন তো সেটা মানতে নারাজ। এরকমই এক ঘোর বর্ষার দিন কয়েকজন বন্ধু মিলে একটা টাটা সুমো বুক করে বেরিয়ে পড়লাম নিমপিঠ আর কৈখালির উদ্দেশ্যে।

বাইপাস-কামালগাজি-বারুইপুর-জয়নগর-বহুরু এই রাস্তা ধরে গাড়ি এগিয়ে চলল। শীতকাল হলে মোয়ার জন্য অবশ্যই একবার গাড়ি দাঁড় করাতে হত। রাস্তার ধারে একটি মাঠের মধ্যে প্রচুর গরু-মোষ কেনাবেচা চলছে দেখে অবাক হলাম। তারপর মনে পড়ল, কদিন বাদেই তো বকরি-ঈদ। গ্রাম্য প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভেদ করে ছুটে চলল আমাদের গাড়ি। গল্প-আড্ডায় প্রায় ঘন্টা তিনেক পার করে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ মিশনে পৌঁছলাম।

যে কোনো আশ্রমের শান্ত, স্নিগ্ধ, পবিত্র পরিবেশ চঞ্চল মনের একটা অদ্ভুত পরিবর্তন আনে, আমাদের ক্ষেত্রেও কোনও ব্যতিক্রম হল না। ছায়া সুনিবিড় আশ্রমের সামনেটা ফুল গাছ দিয়ে সুন্দরভাবে সাজানো। দলের ছেলেরা গেল দুপুরে ভোগের জন্য কুপন করতে আর আমরা মেয়েরা ভাবছি ফ্রেশ হওয়ার জন্য একটা রুম নিলে কেমন হয়। কুপন কেটে এসে খবর দিল দুপুর বারোটার পর থেকে ভোগ দেওয়া হবে আর মেয়েরা আছে শুনে মহারাজ আমাদের একটা ঘর খুলে দিতে বলেছেন। শুনে আমরা তো খুব খুশি। ফ্রেশ হয়ে আশপাশটা পায়ে হেঁটে ঘুরে দেখার জন্য বেরিয়ে পড়লাম।

আশ্রমের সামনেই ভ্যানে করে ডাব বিক্রি হচ্ছে। স্থানীয় লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম কিছুদূরেই সারদা মিশন। গ্রামের ভেতর রাস্তা দিয়ে হাঁটতে বেশ ভালোই লাগছিল। পথের পুরোটাই ঘন গাছে ঘেরা, পাশে পুকুরে হাঁস ঘুরে বেড়াচ্ছে। কত রকম পাখির ডাক শুনলাম, কিন্তু সব দেখতে পেলাম না। একসময় পৌঁছে গেলাম সারদা মিশনে। মেয়েদের আবাসনের মধ্যে দিয়ে মন্দিরে পৌঁছাতে হয় যেটা আবাসিকদের কাছে একটু আপত্তিজনক মনে হল। মিশনের মন্দিরে পৌঁছে পুজো দেখতে লাগলাম। এখানকার পরিবেশও মনোরম। সেখান থেকে বেরিয়ে কিছুদূর এগিয়ে একটা কমিউনিটি হল নজরে এল। অদ্ভুত সুন্দর এর স্থাপত্যকলা। আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে পাওয়া গেল রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র। নাম না-জানা নানান গাছে ছেয়ে আছে পুরো জায়গাটা।

খিদে পাওয়াতে ঘড়ির দিকে চোখ গেল। কাঁটা প্রায় বারোটা ছুঁই ছুঁই। এদিকে আকাশের কালো মেঘ সুবিধার ঠেকল না। তাড়াতাড়ি আবার আশ্রমে ফিরে এসে দেখলাম ভোগের জন্য লাইন পড়ে গেছে। একটি বড় ঘরে সারি সারি বেঞ্চ-টেবিল পাতা। তার ওপর শালপাতায় ভোগ দেওয়া হয়েছে। ব্যাগ বাইরে জমা রেখে, জুতো খুলে সেই ঘরে ঢুকতে দেওয়া হল। প্রার্থনাসঙ্গীত শেষ হওয়ার পর ভোগ খাওয়ার অনুমতি মিলল। খিদের মুখে সব কিছু নিমেষে শেষ করে ফেললাম। খাওয়া শেষে বাইরে বেরিয়ে দেখি তুমুল বৃষ্টিতে আশ্রমপ্রাঙ্গণে জল দাঁড়িয়ে গেছে। বেরোনো দায়। আমাদের আবার কৈখালি যেতে হবে, সে এখনো ঘন্টা খানেকের পথ।

বৃষ্টি একটু ধরতেই বেরিয়ে পড়লাম। দারুণ ভাল রাস্তা। বৃষ্টি হওয়ার পর চারদিকটা আরও ঝকঝকে লাগছে। বৃষ্টিস্নাত রাস্তার জল দুপাশে উড়িয়ে অবশেষে পৌঁছলাম কৈখালি। বর্ষায় মাতলা পুরো মাতাল। রৌদ্রের দেখা মেলায় আগে নৌকাবিহারটা সেরে ফেলার কথায় অনেকেই নিমরাজি হল। তাদের মতে ভরা বর্ষায় মাতলায় নৌকাচড়াটা বেশি ঝুঁকি হয়ে যাবে। কিন্তু আমি মানতে নারাজ। অতএব দরদাম করে নৌকায় উঠে পড়লাম। ঝড়খালি যেতে অনেক সময় লাগবে বলে আশপাশটাই ঘুরিয়ে আনবে স্থির হল, তাই সই। কিছুক্ষণ পর সবার ভয় কেটে গেল ও উপভোগ করতে লাগল মাতলার

তরঙ্গায়িত যৌবন।

নদীর ধারেই কৈখালি ট্যুরিস্ট লজ দেখে মনে হল দু-একদিন থেকে গেলে মন্দ হত না। পাশেই আছে কৈখালি রামকৃষ্ণ মিশন। এখানকার সন্ধ্যারতি দেখার মতো। তবে সন্ধ্যা অবধি থাকলাম না, শুনেছিলাম রাতে জায়গাটা ততো নিরাপদ নয়। স্থানীয় দোকানে চা আর ঝাল মুড়ি খেতে খেতে জানতে পারলাম আগে অসুবিধা থাকলেও এখন লোকাল লোকজনই ট্যুরিস্টদের অনেক সাহায্য করে। কথায় কথায় খেয়াল নেই, দেখি আমাদের ড্রাইভার ফেরার জন্য তাড়া দিচ্ছে এদিকে সন্ধ্যেও নামতে যায়। টিপটিপ বৃষ্টিও শুরু হয়েছে।
অতএব ফিরে চলা। বর্ষামুখর এই সুন্দর ভ্রমণের স্মৃতি চিরদিন মনকে সিক্ত করে রাখবে।

বোস ইন্সটিটিউটে কর্মরত দীপাঞ্জনা দত্ত বিশ্বাস ভালোবাসেন বেড়াতে।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00
Like Be the first of your friends to like this.
tell a Friend